একটি এক্সপেরিমেন্ট

– শাফকাথ সাঈদ

Human life is nothing but another of those God's experiments – কথাটা প্রথম কোথায় শুনেছিলাম তা মনে নেই। তবে ভালো লেগেছিল বলতে পারবো। তা থেকে একটা আইডিয়াও মাথায় এসে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল যদি সৃষ্টিকর্তা আমাদের নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে তাহলে আমরা কেন আমাদের মতো করে আমাদের নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো না!

যাহোক, যেই ভাবা সেই কাজ। কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট–এর বিষয় কি হবে? অবশ্যই ভালোবাসা। মানবজাতির চিরন্তন, শাশ্বত সমস্যা। ভালোবাসার Re-action, Interaction and Ramification. সর্বোপরি How does it feel to be in love. সাবজেক্ট হিসেবে বাছাই করলাম আমাকেই। কেননা নিজের ওপর এতোটুকু আস্থা ছিল যে, আমি কখনো সত্যিকারের প্রেমে পড়বো না। কারণ আমার ধারণা বিয়ে আর তেলাপোকা, এই দুটির ব্যাপারে ভয় আমার সারা জীবনেও যাবে না। মজার ব্যাপার হলো, আমার পরিবারের সকলেরও আমার সম্পর্কে এই ধারণা। তবে কি না এই বিজ্ঞানের যুগে কোনো কিছুই পরীক্ষা না করে বিশ্বাস করা যায় না।

কাজেই প্রেমে না পড়ার ব্যাপারে আমার Resistance power সত্যিকার কতোখানি তা পরীক্ষা করে দেখা। কিন্তু Opposite Sex একজনকে তো বাছাই করতে হবেই। কাজেই বেছে নিলাম এমন একজনকে যে কি না পছন্দ করার মতো। এবং আমি যে একেবারেই পছন্দ করি না সেটাও তো বলিনি।

মূলত আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, একটা Love at first sight গোছের একটা Scenario তৈরি করা। এটাও দেখা যে, এতে তার প্রতিক্রিয়া কি হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাড়ায় যদিও যেখানকার জল সেখানেই থাকবে এ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম।

প্রথমে যে কাজটি শুরু করলাম তা হচ্ছে, ক্লাসে তার পেছনে বসা যতোই হোক বিরক্তিকর ক্লাসের মধ্যে একটা Source of enchantment দরকার আছে। যেহেতু সে আমার ক্লাসমেট এবং আমাদের নির্দিষ্ট কোনো সিট প্ল্যান ছিল না। এটা সহজেই চালিয়ে যাওয়া গেল।

কয়েকদিনেই দেখলাম বেশ কয়েকজন এটা লক্ষ্য করছে।

বুঝলাম প্ল্যান ভালোই এগোচ্ছে। জিনিসটা বেশ এনজয় করছি।

কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখলাম সেও মাথা ঘুরিয়ে দেখছে। তার মানে সেও কিছু একটা আচ করতে পেরেছে।

হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল যা দ্বারা আমার ভালোবাসার (!) প্রকাশ ঘটানো যায়।

আমরা একদিন ক্যাফেটেরিয়ার পাশে বসে পরের দিনের একটা ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে আলাপ করছিলাম। ভাগ্যক্রমে আমার এক্সপেরিমেন্টের সাবজেক্টও সেখানে ছিল। হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ছাতার ব্যবহার কাজে লাগানোর জন্য ব্যাগ থেকে ছাতা বের করে টাঙিয়ে ফেললাম। কিন্তু আমরা সেখানে ছিলাম চারজন। এখানে ছাতা ছিল মাত্র দুটি এবং সে ছাতা নিয়ে আসেনি। কাজেই একটা সুযোগ এসে গেল।

আমি আমার ছাতা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে একটু একটু করে তার মাথার ওপর ছাতা ধরে দাড়ালাম। কিন্তু এমন ভাব করলাম যেন আমি আমার মাথার ওপর ছাতাটা ধরছি। আমার ধারণা ছিল, অন্যরা ব্যাপারটা ঠিকই খেয়াল করবে। হলোও তাই। ফলাফল সে লজ্জায় রাঙা হলো (কতোটুকু বাস্তবে আর কতোটুকু আমার কল্পনায় সে ব্যাপারে আমিও নিশ্চিত নই) এবং অন্য একটা ব্যাপারে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিষয়টা থেকে সবার খেয়াল সরিয়ে নিতে চাইলো।

তবে আমার উদ্দেশ্য সফল। আমারও প্রেমে পড়ার এখনো কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। পরের স্টেপটা চিন্তা করলাম আরেকটু সরাসরি করার জন্য। কিছু একটা গিফট দেয়া যাক। এক্ষেত্রে একসিকিউটিভ নোটবুক–

এর কথা প্রথম মনে এলো। কেননা সে যদি তা ক্লাস লেকচার লেখার জন্য ব্যবহার করে তাহলে সেটা হবে আমার জন্য বিশাল পাওয়া। অবশ্যই আমার উদ্দিষ্ট Scenarioটাকে আরো প্রেমময় করে তোলার জন্য। একটা ভয় আমার মনে সব সময়ই ছিল যে, সে গিফট প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

যেহেতু আমার উদ্দেশ্য ছিল ভালোবাসার (?) কাহিনী গড়ে তোলা, ছ্যাকার কাহিনী নয় – কাজেই আমাকে খুব সাবধানে প্ল্যান করতে হবে। চিন্তা করলাম, জিনিসটা তাকে এমনভাবে দেবো যাতে অন্যদের মনে হয় যে, সে শুধু সেখানে থাকার কারণেই জিনিসটা পেয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করে তা দেয়া হয়নি। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, সেই যেন বোঝে, আসলে তার জন্যই গিফটটা আনা হয়েছে। সে জন্য ভেতরে একটা কিছু লিখে দিতে হবে। কি লেখা যায়? এমন কিছু যা শস্তা কোনো প্রেমের বুলিও হবে না, আমার হিট করতেও সক্ষম হবে।

আগে কার মুখে যেন শুনেছিলাম তিনি নাস্তিক যদিও পরে জানতে পেরেছিলাম যে তা সত্য নয়। বেশ ইন্টারেস্টিং। এই যুগে নাস্তিকতা এক রকম ফ্যাশনই বটে। তাহলে যুৎসই একটা শক থেরাপি কি হতে পারে! অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তা করে বের করলাম এই কোটেশনটা Atheism is not an inevitable component of smartness নাস্তিকতা স্মার্টনেসের জন্য অত্যাবশকীয় কোনো উপাদান নয়। মনে হলো, যদি এই একটা কথা দিয়ে তার চিন্তা জগতে আলোড়ন তুলতে পারি আর সে একজন আস্তিক হয়ে যায় তাহলে এই ভালোবাসার এক্সপেরিমেন্ট–এর বদৌলতে সৃষ্টিকর্তা আমার স্বর্গে যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিলেও দিতে পারে।

যাহোক, এবার Plan Implementation–এর পালা। সৃষ্টিকর্তার নাম অসংখ্যবার স্মরণ করে নোটবুক দুটো সঙ্গে করে ডিপার্টমন্টে–এর দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। একি! বিধাতা আমার পানে সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। বোধ করি স্বর্গের একটা টিকেটেরও রিজার্ভেশন দিয়ে ফেলেছে। আমার সাবজেক্টটি আমারই জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দাড়িয়ে গল্প করছে। এতোক্ষণ মনে করছিলাম সে তার যে বন্ধুটির সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকে সেই বাছাধনই নোটবুকটি ফৃ পেতে যাচ্ছে। তাই একশটি টাকা জলে ফেলার জন্য আফসোস করতে করতে এসেছিলাম।

যাহোক, আমার বন্ধুটির সামনে দাড়িয়েই ডায়রিটি তাকে দিলাম। অতঃপর ধীরে ধীরে যখন সে অন্যদিকে তাকাতে শুরু করেছে তখন তারটি বের করে তার হাতে দিলাম। ওহ, কি বলবো সরি কি লিখবো! তার মুখের সলজ্জ হাসিযুক্ত ভাব দেখে মনে হলো Its worth spending that amount of money to watch this look on her face। পাঠকরা, আবার ভেবে বসবেন না যে, প্রেমে পড়ে গিয়েছি। বেশি সিনেমা দেখার অভ্যাস তো, তাই সিনেমার ডায়ালগ দেয়ার লোভ ছাড়তে পারলাম না।

যাহোক, সে আমার দেয়া ডায়রিটি বুকের সঙ্গে চেপে ধরে চলে গেল।

ওই মুহূর্তে ডায়রিটির সঙ্গে আমার জীবন বিনিময় করার জন্য বিধাতার কাছে আবেদন জানাতে লাগলাম।

তবে এই ঘটনার ফলাফল হলো এই যে, আমার সঙ্গে সে আগে যে টুকিটাকি দুই একটা কথা বলতো তাও বন্ধ করে দিল। মনে হয় আমার শক থেরাপির শকটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। সৃষ্টিকর্তাও আমার স্বর্গের টিকিটের বুকিংটা ক্যানসেল করে দিয়েছিল। কেননা ধর্মে মতি হওয়ার কোনো লক্ষণ পরবর্তীকালে তার মাঝে দেখা যায়নি।

কাজেই আমার এক্সপেরিমেন্টেরও এখানেই ইতি ঘটলো। তবে পরের অ্যসাইনমেন্ট সাবজেক্ট হিসেবে অবশ্যই আমার মতো কোনো গাধাকে বেছে নেবো না যদি আদৌ কোনো ভালোবাসার কাহিনী গড়ে তোলার ইচ্ছা থেকে থাকে। কেননা *ন্যাড়া বেল তলায় একবারই যায়*। বরং অন্য কাউকে সেটআপ করার চেষ্টা করবো।

পাঠকদের জন্য একটা উপদেশ, যদি নিজেদের ওপর আমার মতো কারো আত্মবিশ্বাস থাকে তাহলে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন। বিষয়টা সত্যিই এনজয় করার মতো।

shafkath@yahoo.com

শ্যাওলা

- নিগার সুলতানা

জন্ম তারিখের ঘরে কি লিখবো?

চমকে তাকালাম। হেসে বললাম, কতো তারিখে জন্মেছেন, কোন সালে তা লেখেন।

তিনি লিখলেন, ৪ জুলাই ১৯৫০।

ঘষামাজাহীন তামাটে রঙের এই মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে। তিনিও যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে সেমিনারে।

তার ছিপছিপে অত্যধিক লম্বা শরীরের সঙ্গে চেহারা, পোশাক এবং কথা বলার ভঙ্গি কেমন যেন ওতপ্রোতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধারণ কথা কিন্তু অসাধারণ করে বলেন তিনি। এতো অল্পতে আপন করে নিতে পারার গুণও ছিল অপরিসীম। একটা নাম বলেছিলেন তিনি। কি যেন নাম...।

আমার একটা দোষ হলো, সহজে কারো নাম মনে রাখতে পারি না। অনেক সময় পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে নাম মনে করতে না পারলে ম্যানেজ করার জন্য আগ বাড়িয়ে অনেক কথা বলে চেষ্টা করি নাম বের করতে, না পারলে লজ্জায় জিজ্ঞাসাও করতে সাহস পাই না। পরে নিজে নিজে মানসিক কষ্ট পাই। আবার অনেক সময় নাম যদি হয় তাপসী, আমি হয়তো ডেকে বসলাম বাতাসি। তাই লজ্জা পাবার ভয়ে প্রথমেই অল্প পরিচয়ের কারো নাম ধরে ডাকি না।

যাই হোক। এই ভদ্রমহিলারও একটা লম্বা নাম একটু আগে বলতে শুনেছি। এখন মনে করতে পারছি না। তবে তাকে দেখে আমার প্রথমে যে খটকা লেগেছিল সেটা হলো ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা। হাইট প্রায় পাচ ফিট দশ ইঞ্চি। আমাদের সবার, এমনকি এমবাসিতে উপস্থিত অন্য সকল পুরুষের তুলনায় লম্বা তিনি। সুতরাং মুখ ফশকে বেরিয়ে গেল লম্বু। আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না যে, আমি তার নাম ভুলে গেছি।

লম্বুআপা, এই ডাকে ভদ্রমহিলা একটুও অবাক বা অপমানিত হলেন না। বরং হেসে বললেন, তোমরা আমাকে এ নামেই ডেকো। সবাই এ নামে ডাকে।

অল্পদিনেই তিনি আমাদের গ্রুপের শিরোমণি হয়ে গেলেন। সারাক্ষণ কথা বলেন। ঘন ঘন খান। এতো ঘন ঘন খাওয়া সম্বন্ধে তার যুক্তি হলো শুকনো, লম্বা মানুষ টানে বেশি।

আমরা তেরোজন মহিলা *উইমেন কংগ্রেস*–এ অংশ নিতে লিবিয়া যাচ্ছি। অবরোধের জন্য লিবিয়াতে সরাসরি প্লেন যায় না। আমরা প্রথমে যাবো বাংলাদেশ বিমানে এথেন্স হয়ে রোম। রোম থেকে অন্য প্লেনে মল্টা। মল্টা থেকে ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিতে হবে জাহাজে। অতঃপর ত্রিপলি।

যেদিন আমরা ঢাকা ছাড়ি সেদিন সবার মনটাই ভারাক্রান্ত ছিল। একা সবাই এতো দূর দেশে যাচ্ছি, কি হতে কি হয় বলা তো যায় না!

লম্বু নির্বিকার। এয়ারপোর্টে দেখামাত্রই ফ্যাশফ্যাশে গলায় চিৎকার করে উঠলেন।

গলায় মাফলার জড়ানো ছিল। কথা বলতে পারছেন না ঠিক মতো। তার ফ্যাশফ্যাশে কথা থেকে জানতে পারলাম, আগের দিন রাতে তাকে হাইজ্যাকার ধরেছিল নিউ এয়ারপোর্টের পথে বনানী রেল ক্রসিংয়ে। তিনি ও তার বোন বেবিট্যাকসিতে। হাইজ্যাকররা একটা বেবিট্যাকসিতে হঠাৎ এসে লম্বুদের ট্যাকসি থামালো। চট করে নেমেই বোনের ব্যাগ ধরে টান দিল।

তোরা জানস না, হাইজ্যাকররা যেই না বোইনের ব্যাগ টান দিল, আমি অমনি নাইমা এক চিৎকার দিলাম। দেখস না আমার গলা ভাঙা।

তারপর চিৎকার শুইনা হারামজাদারা ট্যাকসি নিয়া দৌড়।

তাকাইয়া দেখি বইনের ব্যাগ নাই। হাতে শুধু ডাণ্ডা।

পাশ থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলো, ডাণ্ডা মানে?

ডাণ্ডা বুঝো নাই, ব্যাগের ডাণ্ডা।

এতোগুলো মানুষের হাসির শব্দে এয়ারপোর্টের সকল যাত্রী থ হয়ে তাকিয়েছিল। মুহূর্তে ভুলে গেলাম সব কষ্ট। তিনি প্লেনে সারাক্ষণ বলতেন, *হাইজ্যাকাররা আমার গলা নিছে। দেখছোস না কথা বলতে পারছি না। গলা ফাটাইয়া এমন চিৎকার দিছিলাম যে, এখন কথা বলতে পারছি না।*

কি আর করা! আমরাই বুদ্ধি দিলাম, কথা বলার দরকার নেই, ইশারায় কাজ করেন।

হোটেলে দুজনকে এক রুম দেয়া হবে। আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম কার সঙ্গে কে থাকবে।

হঠাৎ লম্বুআপা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে যে মোটা এবং খাটো তার সঙ্গে একটা রুম নিলেন।

আমরা একটু আপত্তি তুললাম।

লম্বু এবং মোটা এক জায়গায় থাকলে তোদের বলতে সুবিধা হবে। আর আমি তো অনেক কিছুই খাই না (সব খাবার বাছতেন)। খাবার নষ্ট না করে ওরে খাওয়াবো।

যুক্তি অকাট্য।

সঠিক সময়ের দুই দিন পর সেমিনার শুরু হয়েছে। সবাই ব্যস্ত। সকাল–বিকাল সেমিনার করে সবাই ক্লান্ত। সাত দিন চলবে।

লম্বুআপা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাল–ভাত খেতে পারছেন না বলে না খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় এক বাঙালি পরিবার প্রতিদিন রাতে ভাত রান্না করে নিয়ে আসে। তিনি রাতে খান, পানি দিয়ে রেখে সকালে পান্তা খান। তবুও তৃপ্তি পাচ্ছেন না। ডাইনিংয়ের কোনো খাবার খাচ্ছেন না। আস্ত মুরগির রান ফ্রাই, খুবুজ, আলুর লাঠি, সবজি সিদ্ধ কিংবা নুডলস তার কাছে অখাদ্য।

রুম থেকে লম্বুআপা কম বের হন। আমরাই যাই তাকে দেখতে। খুব ব্যস্ত তিনি রিসার্চ পেপার নিয়ে। রাত–দিন রিসার্চ পেপার পড়ছেন, কাটছেন আবার লিখছেন। দেখে মনে হচ্ছে সামনে পরীক্ষা। ইসলামি হিস্ট্রি এবং পলিটিকাল সায়েন্সে লম্বুআপা ডাবল এমএ। ভালো ছাত্রী।

তার এই অগোছালো জীবন, সাজসজ্জা, কথা বলার ভঙ্গি দেখে তার স্বামী বিয়ের পর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিয়ের আগে তোমার সার্টিফিকেট দেখলাম না, বন্ধুদের কথায় বিশ্বাসে বিয়ে করলাম। আচ্ছা বলো তো, তুমি ম্যাট্রিক পাস করেছো?

বাসর রাত ছিল জীবনের স্মরণীয় রাত। স্বামী তাকে না দেখেই বিয়ে করেছেন। মায়ের পছন্দ মতোই এ বিয়ে। বিয়েতে তাকে খুব সাজানো হয়েছিল। কনে বিদায়ের সময় এতো কেদেছেন যে, লম্বুআপা জানতেও পারেননি তার অসুন্দর চেহারা চোখের পানি ও ঠোটের লাল রঙয়ের মিশ্রণে এমন হয়েছে যে, দেখে মনে হয়েছে সং সেজেছেন।

স্বামী বেচারা বাসর ঘরে নতুন বৌয়ের এই সৌন্দর্য দেখে গম্ভীর হয়ে শুধু একটি কথাই বললেন, এতো কসমেটিকস দেয়া হলো। তার সঠিক ব্যবহার হয়নি কেন?

শুনে থ। এতোক্ষণে বুঝলেন আসল ঘটনা। কিন্তু কি বলবেন। একা ঘরে যে, বুদ্ধি দেয়ারও কেউ নেই। কিন্তু কিছু একটা বলা দরকার। মুখ না তুলে বললেন, *শুনেন, আল্লাহ যারে রূপ দেয় নাই তার আর সেজে কি হবে?*

স্বামী বেচারা তবুও অনড়। কিছুক্ষণ চুপ থেকে লম্বুকে বললেন, উঠে এসো। মেপে দেখি, কে লম্বা।
তার আত্মা ঠাণ্ডা পানি হয়ে গেছে। কারণ বিয়ের আগে যখন তার শাশুড়ি দেখতে আসেন তখন বাড়ির লোকজন লম্বুকে উঠতে দেননি। সবাই বলেছেন, খবরদার দাড়াবি না। এতোদিন একটা ভালো পাত্র জোটেনি বেশি লম্বা বলে। আজ কপাল গুণে ছেলে না এসে ছেলের মা এসেছে। সুতরাং কড়া নির্দেশ দেয়া আছে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সে কি করবে? এখন তো সব ফাস হয়ে গেছে। উপস্থিত বুদ্ধি ভীষণ। হাজার হলেও রয়াল ফ্যামিলির মেয়ে। লম্বুআপা সব সময় নিজেকে *রয়াল ফ্যামিলির মেয়ে* বলতে পছন্দ করেন।
যাই হোক। স্বামীর নির্দেশে লম্বুআপা খাট থেকে নেমে এলেন এবং নিজেই স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, শোনেন, বিয়ে তো হয়েই গেছে। এখন মাপামাটি করে কি হবে? আসেন মিলেমিশে সংসার করি।
দিক ভ্রমের কারণে আমাদের নামাজ পড়াটা একটা সমস্যা হলো।
একদিন সবাই রুমে আড্ডা দিচ্ছি।
লম্বুআপা এসে হাজির।
সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা নামাজ কোন দিকে পড়ে।
কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারলো না।
তাকে জিজ্ঞাসা করামাত্রই তিনি নির্বিকারভাবে বলে দিলেন, আমার তিন দিকে পড়া শেষ, একদিকে বাকি।
তিনি বয়সে ও জ্ঞানে আমাদের সবার বড়। তবুও অযাচিতভাবে নানান উপদেশ দিতাম। ভালোভাবে কথা বলতে, সুন্দর করে কাপড় পরতে, সাজগোজ করতে। কিন্তু তিনি কিছুই গ্রাহ্য করতেন না। তার মনটা ছিল খুব নরম এবং ভালো। সেধে মানুষকে সুবুদ্ধি দিতেন। মানুষের উপকার করতেন। বলতেন, দেখতে ভালো ছিলাম না বলে সারাক্ষণ পড়তাম।
জানিস, এমএ–তে যখন রেজাল্ট দিল, লোক মারফত খবর পেলাম সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়েছি। বিশ্বাস হয়নি। নিজে গিয়ে ভিড় ঠেলে যখন কেরানিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেরানি আমাকে দেখে ভাবছে, আমি কারো রেজাল্ট নিতে গিয়েছি।
লোকটা বললেন, যান যান, যার রোল নাম্বার তাকে বইলেন মিষ্টি খাওয়াইতে। তিনি সেকেন্ড হয়েছেন।
আমার বিশ্বাস হয়নি। আমি আবারও লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই সত্যি করে দেখেন না নাম্বারটা।
লোকটা তখন একটু রেগে বললেন, নাম্বারটা কার?
আমি মুখ নিচু করে লজ্জায় বললাম, আমার।
শুনে লোকটা হা করে পাচ মিনিট শুধু আমাকে দেখলো।
বাসায় এসে তোদের দুলাভাইকে বলতেই মুখটা গম্ভীর করে ফেললো।
বললাম, তুমি খুশি হওনি? কিছুই বলছো না কেন? কেউ–ই তো ফার্স্ট ক্লাস পায়নি।
তোদের দুলাভাই গম্ভীর। হঠাৎ দেখি আস্তে করে কাউকে যেন বকছে। শুনি তোদের দুলাভাই আমাকে বলছেন, দেশের ভালো ভালো ছাত্রদের আজ এতো অধঃপতন না ঘটলে তোমার মতো মানুষ এমন রেজাল্ট করে?
শোন, আমার দুঃখের কথা, শোন।
তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। পারলে এখনই কেদে ফেলেন।
আমাদের বাসে লম্বুআপা উঠেছেন একদিন। পাকিস্তানি এবং ইনডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে আমরা গান গাইছি। লম্বুআপা অসুস্থ। নাকে কমলার চামড়া শুকছেন। গাড়ির গন্ধে তার বমি হয়। এই কয়দিন তার সঙ্গে গল্পই হয়েছে। তিনি নিজের কথাই বলেছেন। যা বলেছেন তা শুনেছি। ছোট বলে বেশি কিছু জানার আগ্রহ দেখাইনি।

আমিই উঠে তার পাশে গিয়ে বসলাম। আপা, খুব বেশি খারাপ লাগছে?
মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। চোখে টল টল করছে পানি।
এখানে এসে খাবারে কষ্ট পাচ্ছিলেন। জার্নি সহ্য হচ্ছিল না। আমার খুব মায়া লাগলো। পেছন দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, বাসের সিটে হেলান দিন।
শিশুর মতো কথা শুনলেন।
চোখ মুছে দিলাম। বললাম, কারো কথা মনে পড়ছে?
এবার মাথাটা আমার কাধে রেখে ঝর ঝর করে কেদে ফেলেন।
কি বলবো বুঝতে পারছি না। বাস ভর্তি সবাই গান গাইছে, হাত তালি দিচ্ছে। আজ সেমিনারের শেষ দিন।
লম্বুআপা আস্তে করে বললেন, নিগার, আমার কোনো সন্তান নেই। আমি জীবনে মা হতে পারলাম না। আমার বিবাহিত জীবন পুরোটাই কষ্টের। যে মানুষটার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সে সন্তানের পিতা হতে অক্ষম। বিয়ের আগেই সে জানতো। এ জন্যই আমার মতো অসুন্দর মেয়েকে বিয়ে করেছে।
ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা ছবি বের করে আমাকে দিলেন। খুবই হ্যান্ডসাম চেহারার একটা লোক।
বললেন, তোর দুলাভাইয়ের ছবি। মানুষটা খুব সুন্দর দেখতে। অনেক মেয়ে তার জন্য পাগল ছিল। বিয়ের পর আমি তাকে বলতাম, এসব সুন্দর সুন্দর মেয়ে রেখে আমাকে কেন বিয়ে করলে?
একটা সময় সব জানতে পারলাম। আমি প্রতারিত হয়েছি। এ জন্য কার কাছে অভিযোগ করবো? দুজনের মধ্যে তখন দূরত্ব তৈরি হতে লাগলো। আজ সে আর আমার কাছে নেই। নিঃসন্তান আমি সময়ের প্রহরে একা হয়ে গেছি। এখন আমার কোনো অবলম্বন নেই। কোনো ঠিকানাও নেই। ভাসমান শ্যাওলা আমি।
লম্বুআপাকে বললাম, একা কোথায়? আপনি তো পূর্ণ একজন মানুষ। আমাদের সমাজে নির্ভর করা নারীদের সংখ্যাই তো বেশি। স্বামী–সন্তানকে অবলম্বন ও নির্ভর যারা করে তাদের জীবনই তো বরং ভাসমান শ্যাওলা। আপনি তো আত্মনির্ভর এক পূর্ণ মানুষ।

নিউ ইস্কাটন, ঢাকা থেকে

আদর্শ

- মোহাম্মদ হযরত আলী

আমার মেয়ে শান্তা সকাল থেকে নিখোজ। সম্ভাব্য সবখানে খুজেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। বাসার কাজের ছেলেটাও সকালে রিকশায় বাজার পাঠিয়ে দিয়ে আর বাসায় ফেরেনি। অজানা আশংকায় নাতিনের চিন্তায় আমার মা শয্যাশায়ী। ব্যতিক্রম শুধু আমার স্ত্রী টুই। সে নো টেনশন মুডে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলছে।
মেয়ের পক্ষে টুইয়ের বক্তব্য হলো, আমার মেয়ে এমন কোনো কাজ করবে না, যা আমাদের উচু মাথাকে সমাজের মানুষের কাছে নিচু করে দেয়। আর বাড়ির কাজের ছেলে কেন, আমার অনুমতি ছাড়া সে প্রধানমন্ত্রীর ছেলের সঙ্গেও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে বংশের গায়ে কালিমা লেপন করে গৃহত্যাগী হবে না। সে শুধু আমার মেয়ে না, আমার প্রিয় বান্ধবীও। তার সঙ্গে শুধু আমার নাড়ির সম্পর্ক নয়, আত্মার গভীর সম্পর্কও রয়েছে। আমার মেয়েকে মেয়েবেলা থেকে প্রকৃত মানুষের আদর্শে বড় করছি। আমি তাকে বিশ্বাস করি।
মেয়ের পক্ষে মায়ের এই ওকালতি প্রতিবেশীদের মনে হাজারও প্রশ্নের কতোটুকুর সমাধান দিতে পারবে তা জানি না। তবে সন্ধ্যার আগে যদি সে বাড়িতে না ফেরে তাহলে আমার আত্মহত্যা ছাড়া কোনো পথ থাকবে না।
অবশেষে শান্তা সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরলো।
বাসায় ঢোকামাত্র মা মেয়েকে প্রশ্ন করা শুরু করলো।

কোথায় ছিলে সারা দিন?

রনিকাকুর বাসায়। মার্কেটে।

কেন?

কাকুদের জন্য ঈদের কিছু কেনাকাটা করে দিতে।

তুমি কেনাকাটা করে দিলে কেন?

কাকু কাল আব্বুর পা ধরে অনেক কেদেছেন। কিন্তু আব্বু তাকে একটি পয়সাও দেননি। অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগেনি। তাই কাকুদের জন্য চাল, ডাল, চিনি, দুধ আর জামা-কাপড় কিনে দিয়েছি।

টাকা পেলে কোথায়?

আমার বৃত্তির জমানো টাকা থেকে।

তুমি জানো, তোমার ওই রনিকাকু তোমার আব্বুর কতো বড় ক্ষতি করেছে?

জ্যানি। কিন্তু আব্বাই তো একদিন আমাকে শিখিয়েছিলেন ক্ষমা মহত্বের গুণ। *সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই*। আমি আব্বুর পক্ষে রনিকাকুর জন্য সে কাজটিই করেছি।

বলে যাওনি কেন?

যেতে দেবে না ভেবে। আমি ভুল করেছি।

এ রকম ভুল আর কখনো করো না।

জি আচ্ছা। বলে শান্তা তার মায়ের কাছ থেকে আমার কাছে এলো। মাথা নিচু করে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেদে ফেললো। কাদতে কাদতে বললো, সরি বাবা। আমি না বলে গিয়ে ভুল করেছি।

মেয়ের চোখের জলে আমার মনের সমস্ত কষ্ট নিমেষে ধুয়ে-মুছে গেল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, ভেতরে যাও, এ রকম ভুল আর কখনো করো না।

ইসলামপুর, ধামরাই, ঢাকা থেকে

ম্যানিলাতে

- নাহার সিদ্দিকী

প্রবাসে থাকার সময়ে ঈদের দিনে শুধু পারিবারিক সম্মেলন করার কোনো উপায় নেই। কারণ পরিবারের অনেকেই থাকেন স্বদেশে। সে জন্য বন্ধু-বান্ধবের সম্মেলনেই সেখানে আনন্দের বর্হিপ্রকাশ ঘটাতে হয়। তাছাড়া প্রাণের প্রতি প্রাণের, মনের প্রতি মনের, হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক টান রয়েছে। তাই মানুষের এই দলবদ্ধ হবার প্রয়াস।

আমি ও আমার স্বামী এম.এম আর সিদ্দিকী তখন ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলাতে। মি. সিদ্দিকী কলম্বো প্ল্যান স্টাফ কলেজের ফ্যাকাল্টি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন।

ফিলিপিন্সের দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস ঘেটে দেখছিলাম দেশটি এক সময় মুসলমানদের দখলে ছিল। সে সময়ে শহরকে দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি হয়েছিল দেয়াল। এই দেয়াল শেষ করতে লেগেছিল দেড়শ বছর। দেয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে এখনো দেখতে পাওয়া যায় শহরের ধ্বংসাবশেষ যার নাম *ইন্ট্রামুরাস*। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। স্প্যানিশরা পনরোশ শতাব্দীতে রাজা সুলায়মানকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। যদিও ফিলিপিন্সের মিন্দানাও-তে এখনো মুসলিম বিদ্রোহীরা মাঝে মধ্যেই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খবর হয়ে ওঠে। স্পেনের রাজত্বকাল থেকেই ফিলিপিনোরা এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ক্যাথলিক কৃশ্চিয়ান ধর্মাবলম্বী হয়ে ওঠে।

ঈদের দিন এখানে বোঝা যায় না। কোনো ছুটি নেই ঈদের জন্য। তবে আমরা বাংলাদেশিরা অবশ্যই ঈদের দিনটি পালন করতাম সবার সঙ্গে। আমরা ভ্যালিভার্ডে কনডোমনিয়ামের একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম। পাশের

ফ্ল্যাটের পাকিস্তানের ফরিদা জাভেদ ঈদের দিন সকালে নতুন সালোয়ার কামিজ পরে অফিসে যেতেন এবং খুব সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

কি করবেন বেচারি, অফিসেই নতুন কাপড় পরে ঈদের আনন্দ পেতে হয়। রাত শেষে মদের দোকানে গিয়ে নাকি ওমর খৈয়াম সিরাজি না পেয়ে এটো পেয়ালা ধোয়া পানি চেয়েছিলেন দোকানির কাছে। বলেছিলেন নেশার জিম্মাদারী আমার।

আসলেও তাই। আনন্দ, খুশির জিম্মাদারী তো আমাদের কাছেই। পেতে জানলেই পাওয়া যায়।

ম্যানিলাতে বাংলাদেশিদের সংখ্যা খুব কম। প্রধানত পনেরো থেকে আঠারোজন বাংলাদেশি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে, সংক্ষেপে এডিবি–তে চাকরি করেন। তাদের পরিবার ছাড়া দুই তিনটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে বাংলাদেশি আছেন। আর আছেন বাংলাদেশি এমবাসিতে কর্মরত লোকজন। ইরি–তেও কয়েকজন আছেন। তবে সেখানকার কয়েকটি ইউনিভার্সিটি ও কলেজে আমাদের দেশের ছেলেরা পড়াশোনা করছে। বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এরাও আমন্ত্রিত হতো। ঈদের দিনে পশ্চিম বাংলার বাঙালিরাও অত্যন্ত আকর্ষণীয় অভ্যাগত হতেন। তাদের সঙ্গে মিল রয়েছে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। আমরাও আগ্রহ ভরে যেতাম পশ্চিম বাংলা থেকে আগত এডিবি–তে কর্মরত বাঙালি গিন্নিদের আরোপিত স্বরসতী পূজা ও দুর্গাপূজা উৎসবে।

ঈদের আগের রাতে মেহেন্দি উৎসব করতে ভালোবাসতেন মিসেস ফারহাদ জামাল। জালাল এডিবি–তে ছিলেন। আমরা তাদের ড্রয়িংরুমে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে বসে হাতে মেহেদির কারুকাজ করতাম। তারপর টেবিলে সাজানো মজার মজার খাবারের সদ্ব্যবহার।

ঈদের দিনের রাতে হতো মূল অনুষ্ঠানটি। আমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিতাম রান্নার পদগুলো। ডেজার্ট হতো হরেক রকম। সেখানে সেমাই থেকে শুরু করে লাড্ডু, রসগোল্লা কিছুই বাদ যেতো না।

একবার নিরামিষ রান্নার ভার পড়লো আমার ওপর। সারা দিন ধরে কয়েকবার নিরামিষ রাধলাম। কারণ অনেক সবজি এক সঙ্গে রাধলে গলে যাবার ভয় আছে। ডালের বড়ির বিকল্প হিসেবে ডালের বড়া ভাজা নিরামিষ উপাদেয় করার চেষ্টা করলাম। বেশ মজাই লেগেছে খেতে।

আমরা বাংলাদেশি মহিলারা বোধ করি গয়না–গাটি একটু বেশিই পরে থাকি। সুতরাং রাতের আলোকসজ্জার মধ্যে গয়না–গাটি পরা মহিলাকে ঝকমকে মনে হতো। পশ্চিম বাংলার আমন্ত্রিত অতিথিরা দেখতাম, খুব তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছেন আমাদের তৈরি কাবাব ও সেমাই। রান্নার বিলাসিতায় বাংলাদেশিদের পারঙ্গমতার তুলনা নেই!

রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ–এর রেকর্ডটি যে কতোবার বাজতো তার ইয়ত্তা নেই। এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকে যারা চাকরি করছেন, বলাই বাহুল্য মাসের শেষে তারা একটা বড় অংকের মুদ্রা পেয়ে থাকেন। স্বামীরা বিভিন্ন দেশে মিশনে গিয়ে খাটাখাটনি করেন। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীরা ব্যস্ত থাকেন বিলাসী জীবন যাপন নিয়ে। তাছাড়া রয়েছে সুপটু ফিলিপিনো মেইড সংসার চালানোর জন্য। মালী এবং গাড়ির শোফারও আছে প্রত্যেকের। ইচ্ছে করলে একদিনেই ব্যবস্থা করে ফেলা যায় সুন্দর বাগানের। রেডিমেড সবুজ দুর্বার চাপড়া এনে চমৎকার লন হয়ে যাচ্ছে, বড় বড় গাছ নার্সারি থেকে এনে বাগানে বসিয়ে নেয়া হচ্ছে। নেই কোনো বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অবশ্য যদি বাচ্চাদের মানুষ করতে হয় তাহলে স্কুলের পালা শেষ হলে তারাও চলে যায় আমেরিকায় পড়াশোনা করতে। গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেট নেয়ার সময় বাবা মায়েরা সেখানে যান, এই তো জীবন! হ্যা, কিছু আছেন যারা ম্যানিলার দুঃস্থ মহিলাদের উন্নয়নে অংশ নিচ্ছেন বা অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করছেন।

এশিয়ান ডেভেপমেন্ট ব্যাংকে চাকরিরত আমেরিকান এবং ইওরোপিয়ান নাগরিক স্ত্রীদের আমন্ত্রণে গিয়ে দেখেছি, প্রতিটি অনুষ্ঠানের খাবার আয়োজন গৌন এবং মুখ্য হয়ে উঠেছে বক্তৃতামালা যেমন বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মেনোপজের ওপর বক্তৃতা অথবা মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে কথা ইত্যাদি জরুরি বিষয়।

ফিলিপিনো মহিলারা দেশের সকল কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। সে তুলনায় ছেলেরা পিছিয়ে আছে বলে মনে হয়, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত পুরুষ মানুষ তাদের ক্ষমতার তুলনায় বিলাস এবং আমোদে সময় নষ্ট করে। মজার ব্যাপার, এখানে এক বোতল বিয়ারের দাম এক বোতল সফট ড্রংকের চেয়ে কম। বিয়ারের সঙ্গে তো আনুষঙ্গিক উপদানগুলোও চলে আসে। যেমন *কান টানলে মাথা*।

ঈদের দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে ম্যানিলার সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি বলে পাঠকেরা ধৈর্যহারা হলেও আমার কোনো উপায় নেই। কারণ ফিলিপিন্সের খবর তেমন করে অনেকেরই জানা নেই। সৈয়দ মুজতবা আলী দেশ–বিদেশে আফগানিস্তানের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, *অরক্ষণীয়া মেয়ের যেমন বিয়ে হয়নি, আফগানিস্তানের তেমন ইতিহাস লেখা হয়নি।* ফিলিপিন্সের ঈদের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফিলিপিন্সকে বাদ দিই বা কি করে!

ফিলিপিনোদের চরিত্রের একটা দিক আমার খুব ভালো লেগেছে। তা হলো, এরা অনেকটা এখনো যৌথ পরিবারে বিশ্বাসী। তাছাড়া পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের তারা অত্যন্ত সম্মান করে এবং যত্ন করে। এমনকি ফ্যাশন শো–র মতো অনুষ্ঠানে হুইলচেয়ারে বসে বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদেরকে ঠেলে তরুণ–তরুণীরা নিয়ে যায়। জাপানিজদের কিমানোর ওপর ফ্যাশন শো–র অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে দেখলাম অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরা এসেছেন সেখানে। মিসেস একিনোকেও সেই অনুষ্ঠানে দেখতে পেলাম। ফিলিপিন্সের মহিলারা খুব হাসিখুশি।

একদিন আমার বাসার পার্টটাইম মেইডকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর আসল রহস্যটি কি? উত্তরে জানলাম তারা বিশ্বাস করে, হাসিখুশি না থাকলে চেহারা খারাপ হয়ে যাবে। সুতরাং *রামগরুরের ছানা, হাসতে যাদের মানা,* সেসব মেয়েদের চেহারা খারাপ হয়ে যায় অতি শীগগিরই বলেই তাদের ধারণা।

ঈদের প্রসঙ্গে আবার আসছি। দেশে থাকতে আমরা ঈদ করে থাকি অন্তত তিনটি দিন ধরে এবং ঈদের দিনটি থাকে ওপেন হাউস পার্টির মতো অর্থাৎ সারাটা দিনের যখনই কেউ আসুক অতিথির জন্য থাকবে উপাদেয় খাবার। ফিলিপিন্স, বিশেষত ম্যানিলাতে কৃসমাস উপলক্ষে থাকে অন্তত পনেরো দিনের ধুমধাম। কতো অসংখ্য গিফট যে কেনা হয় তার ইয়ত্তা নেই। গিফট প্যাকিংয়ের জন্য রয়েছে ব্যাপক আয়োজন। মেগামলে গিয়ে প্যাকিংয়ের ওখানে লাইন ধরে থাকতে হয়। কৃসমাসে আমরা অনেক গিফট পেতাম, দিতেও হতো অনেককে। এয়ারপোর্টে দেখা যেতো বিভিন্ন দেশ থেকে ফিলিপিন্স প্রবাসীরা ফেরত আসছে ইয়া বড় সব লটবহর নিয়ে। ছোট কাঠামোর স্লিম মেয়েরা ট্রলির ওপর সুটকেসের চার তলা, পাচ তলা বানিয়ে ঠেলতে ঠেলতে আসছে হাসিমুখে।

সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে ফিলিপিনো কর্মীরা। আর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার, যখন ফিলিপিন্স এয়ারলাইন্সের প্লেন এয়ারপোর্ট স্পর্শে করে, সবাই হাততালি দেয়। দেখেছি প্লেনে বসে বসে আর শুনেছি প্রবাসীদের দেশে ফেরার উপলক্ষে এই করতালি। যারা বাইরে চাকরি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন, এয়ারপোর্টে তাদের সাদর সম্ভাষন জানানো হয়ে থাকে। এই ব্যাপারটা আমরা শিখবো কবে?

নিজের সংসারটা নিয়েই আমরা ব্যস্ত, দেশটা দেখার সময় কোথায়! দেশের সব দরজার তালায় মরচে পড়ে গেলে চাবি দিয়ে আর খোলা যাবে না। দেশের আকাশটা যে নীল, গাছপালাগুলো যে সবুজ, তাও দেখা যাবে না। তখন এগুলো দেখতেই ছুটতে হবে আমেরিকা, ইওরোপে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

নামকরণ

- মোহসীন ভূঞা

তিনি কারো ডিরেক্টরদাদা অথবা নানা, বহুজনের ডিরেক্টরচাচা অথবা মামা আর অনেকের ডিরেক্টর সাব অথবা ভাই। শিক্ষা অধিদফতরে উচ্চ পদে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজ নাম সফিউদ্দিন বিস্মৃত হয়েছে পদবির আড়ালে, মানুষের কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসায়। বিলেতে গিয়েছেন ষাটের দশকে। কিন্তু তার শাদাসিধে পোশাক ও আচরণ তাকে অসাধারণত্ব দিয়েছে।

এবারকার বন্যার কিছু আগে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে তার ছেলে মামুনকে নিয়ে রাত দশটায় যখন গ্রামের বাড়িতে হাজির হই, তিনি ব্যস্ত হয়ে নিজ হাতে বিছানা গোছাতে শুরু করেন।

এ দৃশ্য দেখে তাকে নিবৃত্ত করতে চাইলে আমাকে ততোধিক বিনয়ের সঙ্গে বলেন, তুমি হচ্ছো অনারেবল গেস্ট।

তাকে বলেছি, ইউ আর দি অনারেবল পারসন। কিন্তু তার আতিথেয়তা থেমে থাকেনি।

খাওয়ার পর্ব শেষে তিনি বেশ উৎসাহ সহকারে পাশের রুমে শুয়ে থেকে শেরপুরের ইতিহাস শুনিয়েছেন। শেরশাহের নাম থেকে শেরপুরের উৎপত্তি। সে সময় শেরপুর চারটি জমিদারি অঞ্চল নয় আনি, তিন আনি, আড়াই আনি ও দেড় আনিতে বিভক্ত ছিল। এখানকার কালিদহ সাগর ও বারো দুয়ারী মসজিদ দর্শনীয় এবং আঞ্চলিক ঐতিহ্যমণ্ডিত। কোদাল ঝাড়া ঢিবির উৎপত্তি হয়েছে কালিদহ সাগর কাটতে গিয়ে শ্রমিকদের কোদালে লেগে থাকা মাটি একটা নির্দিষ্ট স্থানে ঝেড়ে ফেলাতে। আরো অনেক তথ্য জানালেন অকপটে আর মুগ্ধ শ্রোতা আমি।

সবশেষে তিনি যে গল্প করলেন, একে গল্প না বলে *কাহিনী* বলা উচিত। কারণ গল্পে কিছু অংশ উপেক্ষিত থাকে। আমি তার কাহিনী শুনে মোহিত হয়েছি।

একবার শেরপুরের কোনো এক স্কুলকে সরকারি তালিকাভুক্ত করার জন্য পরিদর্শন ও তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে। সে সময় স্কুলের নামকরণের যথার্থতা ছিল প্রয়োজনীয় শর্ত। সব কাজ শেষে স্কুলের নাম নিয়ে সংশয়ে পড়েন তিনি। এক অংশের দাবি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজপতি সুরেন্দ্র মোহন সাহার নাম অপর অংশের দাবি সমাজসেবী আফসার আলীর নাম।

দুজনেই বেশ বিত্তশালী ও প্রভাবশালী হওয়ায় বিপাকে পড়তে হয় তাকে।

প্রথিযযশা সাংবাদিক খোন্দকার আবদুল হামিদ ওই সময়ে শেরপুরে থাকতেন এবং ডিরেক্টরচাচার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক ছিল। রাতের বেলায় তার কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইলেন।

একজন নীতিবান সাংবাদিকের জবাব দিলেন তিনি। সমাজ সেবা ও মানবতায় যার অবদান সবচেয়ে বেশি তার নামেই নামকরণ হওয়া উচিত।

বেশ আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এসে এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলা স্থির করে এক বিশেষ তথ্য পেলেন। সেখানে তখনকার আমলে হিন্দু ব্যবসায়ী ও সমাজপতিদের প্রভাব ছিল। সকালবেলায় ধূপ-ধোয়া দিয়ে এক মিষ্টি ব্যবসায়ী যাত্রা শুরু করতেই মিষ্টি কিনতে আসা এক মুসলমানের পা অসাবধানতাবশত দোকানের ভেতরে ঢুকে যায়। এতে অগ্নিশর্মা বিক্রেতা সমস্ত মিষ্টি অপবিত্র করার দায়ে অভিযুক্ত করে সব মিষ্টির দাম দিতে বলে। অসহায় ক্রেতা অপরাগতা প্রকাশ করায় কর্মচারীদের সহায়তায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলা হয়।

অন্যান্য লোকজন যখন এ তামাশা দেখছিল তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আফসার আলী। ঘটনা শুনে তিনি সমস্ত মিষ্টির দাম দিয়ে দিলেন। তারপর মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন, দোকানের দাম কতো?

বিক্রেতা চোখ ছানাবড়া করে জানতে চায়, দোকানের দাম দিয়ে কি হবে?

আফসার আলী বলেন, পা ভেতরে প্রবেশের কারণে যদি মিষ্টি অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে একই সঙ্গে দোকানও অপবিত্র হয়েছে, তাই দোকানও বিক্রি করতে হবে।

এতে বিবাদ বেড়ে যায়। মালিকপক্ষ লোক জড়ো করতে থাকে।

এদিকে তিনিও সরিষার তেল বেচতে আসা কলুদেরকে একত্রে করে আক্রমণ করে বসেন। তিন আনির হিন্দু জমিদার সংঘর্ষের খবর পেয়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ঘটনাস্থলে হাজির হন। জমিদার সমস্ত বিবরণ শুনে আফসার আলীর প্রশংসা করে ফিরে যান।

এ কাহিনী শোনার পর ডিরেক্টর সিদ্ধান্তে আসেন, স্কুলের নাম আফসার আলীর নামে হলে একজন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীর এবং সমাজসেবীর প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হবে।

আমাদের দেশে কিছু নাম ভূতের গলি, গরম পানির গলি, ফকিরের পুল, ছাগলনাইয়া ও বৌবাজার প্রভৃতির কথা শুনলে প্রশ্ন জাগে, দেশে গুণীজন তথা সৎ লোকেরা কি বিরল হয়ে গেছে?

ভিয়েনার প্রচুর রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে সে দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে। একটা রাস্তার নাম দেখেছি, *১১ ফেব্রুয়ারি প্লেস*। দেখা মাত্র ২১ ফেব্রুয়ারির কথা মনে পড়েছে। আমরাও তো আমাদের অহংকারকে আরো মহিমা দিতে পারি।

যদিও নামে কিছুই যায় আসে না তবুও যারা দেশের প্রতি ভালোবাসায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগের মাধ্যমে, কর্মনিষ্ঠা ও সততায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি সম্মান দেখানোয় আমরা উদাসীনতা এবং কৃপণতায় লিপ্ত হই তবে আমাদের দেশ দুষ্ট লোক ও সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য হবে। তারাই হবে সম্মানী ব্যক্তি। তাদের ইশারায় সৎ লোক হবে অসহায় ও নগন্য।

ঠিকানা বিহীন
mohsinbhuian@msn.com

ত্যাজ্য পিতা

আমি একটি ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান। আমার পিতা জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত (ছাপ্পান্ন বছর বয়স) নারীতে মগ্ন। তিনি এ পর্যন্ত নয়টি বিয়ে করেছেন। কিন্তু কোনো মেয়েই সংসার করতে পারেনি।

স্বামীকে আমার মা সব সময় দেবতার আসনে বসিয়ে প্রতিনিয়ত পূজা-অর্চনায় ব্যতিব্যস্ত। মায়ের নিজের সন্তানদের নিয়ে ভাবনা নেই। বড় বোনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাবা তাকে বিয়ে দিয়েছেন। স্বামী-শ্বশুর বাড়ির অত্যাচারে বিধবা হওয়ার পথে। বড় দুলাভাই নেশার জগতের ছোটখাটো সম্রাট।

পিতার বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু করেছি। ইতিমধ্যেই পিতাকে *ত্যাজ্য পিতা* ঘোষণা দিয়েছি। দ্রুত আমি আদালতের শরণাপন্ন হবো। ছোট বোন বাপের চক্রান্তের শিকার হয়ে মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। ছোট বোনকে বিক্রি করে দিয়েছেন। পিতা ইদানীং যে মেয়েকে বিয়ে করেছেন, ছোট বোনকে তার ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজের সন্তানকে পণ্যের মতো বিক্রি করেছেন। ছোট ভাইটা মাস্তানি ও আড্ডায় সমর্পণ করেছে নিজেকে। পিতা সরকারি একজন কর্মকর্তা, মাতা গৃহিণী।

পাঠকবৃন্দ, মনে হবে আমি কোনো গল্প বা উপন্যাস লিখছি। বিশ্বাস করুন, এটা আমারও মনে হয়ে থাকে। কিন্তু এটা দ্রুত আদালতে গড়াবে। প্রশ্ন একটিই আমার, এ ধরনের লোকদের কেমন সাজা হওয়া উচিত?

নামও পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
খুলনা থেকে

ছাই

- প্রিন্স আহমেদ রিপন

সকাল থেকে মনটা খুব খারাপ। কয়েকদিন আগে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পাওয়ার কারণে সব সময় মনটা খারাপ থাকে। ভাবলাম শহরে গেলে মনটা ভালো হতে পারে। কিন্তু শহরে কোথায় যাবো যেখানে গেলে মন ভালো হয়ে যাবে! সিদ্ধান্ত নিলাম পতিতালয়ে যাবো।

ব্যস, বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে। দড়াটানা থেকে রিকশা নিয়ে বললাম, মাড়োয়ারি মন্দির।

রিকশাচালক একবার আমার দিকে তাকালো।

বুঝলাম সে আমাকে ঘৃণা করছে। কারণ আমি মাগীদের কাছে যাচ্ছি। *মাগী* শব্দটা মনে পড়ায় মনে একটু হাসি এলো। জীবনে এই প্রথম!

মন্দিরের সামনে এসে রিকশা থামলো।

রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দাড়িয়ে আছি। পতিতালয়ের তিনটা গলি। আগে কখনো আসেনি। কাউকে চিনি না। কোন গলিতে ঢুকবো চিন্তা করছি। এমন সময়ে দেখি আমার এক পরিচিত চাচা যাকে আমরা গ্রামের সবাই সম্মান করি।

কিন্তু তিনি এখানে কেন!

চাচা মাঝখানের গলিতে ঢুকে পড়লেন।

ভাবলাম আমার মতো চাচার মনেও হয়তো দুঃখ রয়েছে। তাই ভুলতে আসেন।

শেষে এক দালালকে ধরলাম। বললাম, ভাই, আমি তো নতুন এসেছি। আমাকে ভালো সুন্দরী একজনের কাছে নিয়ে চলুন।

তারপর তার পেছন পেছন চললাম। লোকটা আমাকে তৃতীয় গলিতে নিয়ে গেল।

গলির ভেতর দিয়ে হাটছি। দুই পাশে পতিতারা সেজে দাড়িয়ে আছে। একজন আমার গেঞ্জিতে টান দিল পেছন থেকে।

একবার তাকিয়ে লোকটার পেছন পেছন চললাম। সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম।

লোকটা একটা ঘরের দরজায় টোকা দিল।

ভেতর থেকে অপূর্ব সুন্দরী একজন বেরিয়ে এলো।

লোকটা বললো, নতুন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ভেতরে যান।

লোকটার হাতে বিশ টাকা গুজে দিলাম। তারপর ঘরে গিয়ে বসলাম।

মেয়েটি ঘরের দরজাটা লাগিয়ে দিতে দিতে বললো, কি নাম তোমার?

আস্তে করে বললাম, রিপন।

মেয়েটি এবার চুলের খোপা খুলতে খুলতে বললো, রিপন? সুন্দর নাম, আমার নাম রত্না। আমি হিন্দু মেয়ে। ড্রংক করার অভ্যাস আছে?

না। তবে করবো।

আচ্ছা, আজই প্রথম এলে?

হ্যা।

কেন? কোনোদিন যখন আসোনি, কি দরকার ছিল এই অপবিত্রতা গায়ে লাগানোর?

মনের কষ্ট ভুলতে এলাম।

কিসের কষ্ট? কাউকে হারানোর?

হ্যা।

কোনো মেয়েকে?

হ্যা।

খুব ভালোবাসতে?

হ্যা, খুউব।

রত্না এবার হি হি করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, ভালোবাসা? এটা একটা নাটক। যে যেমন অভিনয় করতে পারে তারটা তেমন হয়। রিপন, পৃথিবীতে সবাই স্বার্থপর। ভালোবাসার দাম নেই। যাক এসব। নাও, জলদি করো।

বললাম, কি?

রত্না হেসে বললো, কাপড় খুলে ফেল।

কেন?

একজন মাগীর কাছে এসে ভদ্রতা দেখাচ্ছো? ভদ্রতার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমাদের সকল পুরুষকে আমি চিনি। তাড়াতাড়ি করো।

আমি তো ওসব কিছু করবো না।

তাহলে কেন এসেছো?

গল্প করতে?

কিন্তু আমরা দেহ বিক্রি করি, গল্প করার সময় আমাদের নেই।

আচ্ছা, তুমি তো সব দিক থেকে সুন্দর একজন মেয়ে, তুমি এখানে এলে কেন?

হঠাৎ রত্নার মুখটা শ্রাবণের আকাশের মতো কালো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই প্রথম। একজন মানুষ জানতে চাইলো আমি কেন এই পথে।

এ কথা আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না?

না। সবাই তো চায় আমরা এখানে আসি। প্রতিদিন নতুন নতুন মেয়েরা আসুক। আর সমাজের নেতা গোছের লোকগুলো, ধনী লোকগুলো তাদের ইচ্ছা মতো ভোগ করুক।

তুমি কেন এসেছো সেটা বলো।

রত্না বলতে শুরু করলো, তুমি যেমন ভুল করেছো, আমিও তেমনি একটা ভুল করেছিলাম। অর্থাৎ একজনকে ভালোবেসেছিলাম। তখন ভাবতাম তাকে না পেলে হয়তো বাচবো না। তাই বাবার পছন্দের পাত্রকে বিয়ে না করে বিয়ের আগের দিন পালিয়ে এসেছিলাম। সেই প্রতারক আমাকে এই যশোর নিয়ে আসে। তারপর ইচ্ছা মতো আমাকে ভোগ করে বসিয়ে রেখে চলে যায়। সে আর আসেনি। দুই দিন অপেক্ষার পরও যখন তাকে পেলাম না তখন চোখে অন্ধকার দেখি। এদিকে গ্রামে বাবাকে সবাই ঘৃণায় থুথু ছিটায়। এক পুরুষকে ভাই ডেকে সাহায্য চেয়েছিলাম। সেও কৌশলে তার মনের ইচ্ছা পূরণ করে। তারপর বিক্রি করে দিয়ে যায় এই মাড়োয়ারি মন্দিরে।

রত্না কেদে ফেললো।

চোখ মুছে নিয়ে আবার বলতে থাকলো। অনেকবার চেয়েছি আত্মহত্যা করবো। কিন্তু পারি না। যখনই চেয়েছি তখনই অন্য সমস্যা এসে ভর করতো। তবে এখন সহ্য হয়ে গেছে। মনে হয় পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছি, অনেক শিখে ফেলেছি। যাক এসব, তোমার মনে দুঃখ কেন? তুমি তো পুরুষ!

যাকে ভালোবাসতাম গভীর ভাবে, কি না করলাম তার জন্য! একটু রাগ করলে চোখের জল, নাকের জল এক করতো। আমিও ভাবতাম এ মেয়েটিকে ছাড়া আমি বাচবো না। শেষে অন্য একজনকে বিয়ে করে বেশ সুখে

দিন কাটাচ্ছে। সেদিন আমাকে দেখিয়ে তার স্বামীকে বললো, এই বেয়াদব ছেলেটা আমার পেছনে ঘুরঘুর করে আমাকে বিরক্ত করতো।

ভালোবাসার প্রতিদান যে এমনি হয় ভাই।

ভাই! আমাকে ভাই বললে?

আমি পুরুষ জাতকে ঘৃণা করি। বাবা ছাড়া তোমাকেই একজন ভালো পুরুষ পেলাম। অন্যদের আসনে তোমাকে বসিয়ে অসম্মান করতে চাই না ভাই। ভাবতাম পুরুষরাই এমন। কিন্তু না, সবাই সমান না।

বললাম, তুমি বয়সে আমার চেয়ে হয়তো বড় হবে। তোমাকে আমি দিদি বললাম।

দিদি! চমকে উঠলো রত্না। তারপর কেদে ফেললো। বললো, ছোট ভাই ছিল একটা। নাম স্বপন। সে সব সময় দিদি বলে ডাকতো। জানি না কেমন আছে তারা। আজ তোমার মুখে দিদি ডাক শুনে স্বপনের কথাই মনে পড়ছে। আমি একটা অনুরোধ করবো, রাখবে?

বলো, চেষ্টা করবো।

এখানে আর কোনোদিন আসবে না। তোমার মতো ভালো ছেলে এখানে কেন আসবে?

তোমার মতো শিক্ষিত, ভালো দিদি যদি এখানে থাকে তাহলে তার ভাই কেন তাকে দেখতে আসবে না?

না ভাই প্লিজ, তুমি আর এসো না।

ঠিক আছে।

উঠে দাড়ালাম। পকেট থেকে দুইশ টাকা বের করে রত্নার হাতে দিতে গেলাম।

সে বললো, এটা কি?

অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম। সর্দারকে তো ভাগ দিতে হবে।

সর্দারকে দেয়ার মতো টাকার অভাব তোমার দিদির নেই।

বাধ্য হয়ে টাকা আবার পকেটে পুরে ফিরে এলাম। ভাবলাম পৃথিবীর সবাই হয়তো নিজে দুঃখী শুধু আমার প্রেমিকা ওই প্রতারক মেয়েটা ছাড়া। ভাবতে ভাবতে বাসায় চলে এলাম।

রত্নাদিদির নিষেধ সত্ত্বেও গিয়েছি তার কাছে। তার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস কিনে নিয়ে যেতাম। খুব খুশি হতো দিদি। একদিন তাকে বললাম, খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে এখান থেকে মুক্ত করবো।

রত্নাদি হেসে বললো, পুড়েই যখন গেছি তখন ছাইয়ে পানি দিয়ে কি হবে? তার চেয়ে বাতাসে উড়ে যাক। সেই ভালো।

ঈদের আগের দিন বিকেলে *জেস টাওয়ার* মার্কেটে ঢুকলাম। দিদির জন্য কেনাকাটা করবো। এবং আজই মুক্ত করবো দিদিকে এই পতিতার জীবন থেকে। সুন্দর দেখে দুটি শাড়ি, পেটিকোট, ব্লাউজ, প্রয়োজনীয় নানান কসমেটিক্স কিনলাম। জুয়েলার্স থেকে একটা সোনার চেইন কিনলাম। দিদির মুক্ত জীবনের প্রথম উপহার দেবো এগুলো। সবগুলো প্যাকেট করে গেলাম আবার সেই পরিচিত মাড়োয়ারি মন্দিরে।

দিদির ঘরে ঢুকেই দেখি অন্য একজন মেয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, রত্না কোথায়?

উত্তর এলো, সে তো আত্মহত্যা করেছে ছয় দিন আগে।

কবর কোথায়?

মেয়েটি বললো, মাগীদের আবার কবর? ভৈরবের জলে ফেলে দিয়েছে।

কান্না আটকাতে পারলাম না। দিদিকে মুক্ত করবো বলে এতো কিছু করলাম আর সে নিজেই মুক্ত হলো। চোখের পানিতে দুই গাল ভিজে গেছে।

হাটতে হাটতে দড়াটানা ভৈরব বৃজের ওপর এলাম। নিচে তাকালাম, স্বচ্ছ পানি। দিদির জন্য কেনা শাড়ি, চেইন সব কিছু ফেলে দিলাম ভৈরবের জলে। রাস্তায় প্রচুর মানুষের ভিড়। সবাই কেনাকাটা করে ফিরছে, কেউ

যাচ্ছে। সূর্য ডুবে গেছে। অনেকেই নতুন চাদ দেখার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। নদীর পানি থেকে শীতল একটা হাওয়া এলো।

মনে পড়লো দিদির হাসি মুখের সেই কথাটি, *পুড়েই যখন গেছি তখন ছাইয়ে পানি দিয়ে কি হবে? তার চেয়ে বাতাসে উড়ে যাক। সেই ভালো।*

কথাটির সঠিক অর্থ এখন বুঝলাম। হু হু করে কেদে উঠলো মনটা দিদির জন্য! আমার পতিতা রত্নাদিদির জন্য।

কোতোয়ালি, যশোর থেকে

নিয়তি

– মোহাম্মদ শহীদউল্লাহ

আমরা দুই ভাই, দুই বোনের মধ্যে আমার অবস্থান মেজ। আমার বড় বোনের বিয়ে হয় ১৯৯২ সালে। ১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের পরিবর্তনের ফলে আমার অবস্থান হয় বিরোধী শিবিরে।

আস্তে আস্তে আওয়ামী লীগের হামলা–মামলা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমার আব্বার মনে শংকা বাড়ে, ছেলে আবার কোনো মামলায় জড়িয়ে জেলে না যায়! কারণ এলাকায় আমাদের বংশের এমন দাপট ছিল যে, কেউ জেলে যাবার কথা কল্পনাও করতে পারতো না। আমি তখন ওয়ার্ড শাখার প্রভাবশালী সদস্য। তাই ভয় একটু বেশি।

এদিকে আব্বার বয়সও হয়েছে। তাই তিনি কোনো ধরনের ঝামেলায় যেতে রাজি নন।

আমাকে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে এমিরেটস বিমানে করে কুয়েতে পাঠানো হয়। কুয়েতে এসে প্রায় দেড় বছর একটি সুপারমার্কেটে কাজ করি। তারপর একটি দোকানে স্বল্প সময়ের জন্য কাজ নিই। আমার দোকানের পাশে একটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশে কথা বলার দোকান ছিল। সেখানে তানজিল নামে একটি ছেলে কাজ করতো। কুয়েতে ইন্টারনেট ব্যবসা নিষিদ্ধ ছিল। এই ব্যবসায় যাকে হাতে–নাতে ধরতে পারতো তাকেই দেশে পাঠিয়ে দিতো।

২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জোট ক্ষমতায় এলে আমরা একটি পার্টি দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। শপথ নেয়ার কিছু দিন পর একদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় হঠাৎ কুয়েতের গোয়েন্দা পুলিশ ইন্টারনেটের দোকানে রেইড করে। ওই দিন সকালবেলায় এক ইনডিয়ানে কাছ থেকে কিছু অ্যারাবিয়ান ছেলেরা টাকা ছিনিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার সাক্ষী ছিল আমার সহকর্মী রতন।

বিকেলবেলায় যখন আমি ক্যাশে বসা ঠিক ওই সময় কিছু গোয়েন্দা পুলিশ দোকানে ঢুকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় তোর বস?

তাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছি। এমন সময় আরেকজন এসে চড়–থাপ্পড় মারতে থাকে।

আমি একটি ধরি তো আরেকটি মুখে পড়ে।

আমার এই অবস্থা দেখে রতন বললো, সে কিছু জানে না।

তখন পুলিশের দল তাকেও মারা আরম্ভ করলো। তারপর দুজনের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিয়ে গাড়িতে নিয়ে বসালো। দেখলাম সেখানে আরো অনেককে গ্রেফতার করেছে।

কিছুক্ষণ পর আমাকে এবং আরেকজনকে রেখে বাকি সবাইকে ছেড়ে দেয়। তারা মনে করেছে যে, আমাকে রাখলে তাদের কাছে আমার বসের কথা স্বীকার করবো।

তারপর অন্যান্য এলাকা থেকে আরো কিছু লোক ধরে তাদের হেড অফিসে নিয়ে যায়। এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এই কমপিউটার তোমার, এটি তোমাকে চালাতে হবে।

তাদেরকে বললাম, তোমরা আমাকে গ্রেফতার করেছো দোকান থেকে এবং আমি এসব কিছু জানি না।
তখন তাদের মধ্যে একজন বললো, হ্যা, সে সত্যি বলেছে।
আরেকজন জিজ্ঞাসা করলো, তোমার আকাম দোকানের কি না?
বললাম, না। এটা কম্পানির।
পাশে জেলখানা ছিল। তারা সেখানে আমাদের সকলকে নিয়ে গেল। অবশ্য আমার জন্য উকিল এসেছিল। তখন তারা উকিলকে বলে, বিশ হাজার দিনার দিলে ছেড়ে দেবে।
তখন উকিলকে বললাম, তুমি গিয়ে বলো আমি দেশে চলে যাবো। শুধু আমার যেসব জিনিস আছে সেগুলো যেন প্যাক করে দিয়ে যায়।
আমার বস অবশ্য প্রতিদিন দেখার জন্য আসতেন। কাদতেন আমাকে ধরে।
তাকে সান্ত্বনা দিতাম। প্রায় প্রতিদিন টেলিফোনে কথা হতো। তারপর তিনি বিভিন্নজনের মাধ্যমে চেষ্টা করতে লাগলেন আমাকে ছাড়ানোর জন্য। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন।
আমাকে যখন ২৮ অক্টোবরে পুলিশের দল বিমানে তুলে দিতে নিয়ে গেল তখন তিনি সমস্ত জিনিস নিয়ে এয়ারপোর্টে উপস্থিত হন। এবং অনেক কষ্ট করে জিনিসগুলো দিতে পারেন। তারপর আমি বাংলাদেশে চলে আসি।
তেরো মাস পর আবার কুয়েত আসি আরেকজনের ছবি পাল্টিয়ে।
যে জেলখানার ভয়ে বাংলাদেশ ছাড়লাম, সেটিতেই আমাকে ঢুকতে হয়েছিল কুয়েতে গিয়ে।
একেই বলে নিয়তি!

কুয়েত থেকে

প্রহরা তেজারতি

- জাহাঙ্গীর আলী

অবশেষে তাদের সঙ্গী না হয়ে উপায় রইলো না। কষ্ট করে পাসপোর্ট ভিসার মতো ঝামেলাগুলো যখন নিজেরা শেষ করে রেখেছে তখন কি আর করা! অথচ এই আমি একাত্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় জড়িত থেকেও সে পথ মাড়াইনি। দলের সবাই একে একে সেখানে গিয়ে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে নিরাপত্তার দোহাই এবং গভীর উদ্বেগ জানিয়েও টলাতে পারেনি।
কেন জানি সে দেশে গিয়ে যুদ্ধ করতে মন একেবারে সায় দেয়নি। অথচ বাড়ির পাশেই বিশাল পদ্মা। সেই শুকনো পদ্মায় সামান্য একটু পথ মাত্র পার হলেই ওই দেশ। শেখপাড়া ক্যাম্প যেখানে হাজার হাজার পরিচিত মুখ গিজ গিজ করছে। এতো সহজ ও সামান্য পথ, তবুও ইচ্ছা করেনি। এতো মানুষের বিশাল স্রোতও টানতে পারেনি আমাকে। আজ প্রায় দুই যুগ পরে সুহৃদয়ের অনুরোধ ফেলতে না পেরে ঢেকি গিলতেই হলো।
ইনডিয়ার মালদহে পৌছে ট্রেনের টিকেট না পেয়ে কালো বাজারে স্টেট বাসের বাড়তি দামে টিকেটে অতি ভোরে গিয়ে পৌছালাম এককালের বিস্ময় কলকাতা মহানগরে। জাকারিয়া স্ট্রটের (এখন রবীন্দ্র সরণি) *হোটেল অ্যামবাসাডর*–এ একটু জিরিয়ে নিয়ে সারা দিনই কেটেছিল ছোট্টকাল থেকে শোনা গ্রেট কলকাতার রাজপথ আনাচে–কানাচে ঘোরাঘুরি করে। টই টই করে ঘুরে তিনশ বছরের পুরনো কলকাতার পুরনো কীর্তিগুলো দেখেছিলাম। কিন্তু পাতাল রেল মানে মেট্রোতে চড়তে গিয়ে কেমন যেন একটা হোচট খেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যৌবন হারানো ক্ষয়ে যাওয়া, রঙচটা এটা কি আসলে সেই কলকাতা! রিজেন্ট পার্ক ও টালিগঞ্জের রূপ ধাধানো প্লাস্টিক সার্জারি করা চাকচিক্য বুঝতে কষ্ট হয় না। রূপ–যৌবন ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা শেষ হয়ে যায়নি এখনো তার।

নাখোদা মসজিদ থেকেই শুরু হয়েছিল পাদুকা দর্শনী কাফফারা। রাজধানী দিল্লিতে এর আরো রমরমা কারবার। মসজিদ মাজার কোথাও রেহাই নেই। বিখ্যাত সাধক নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মাজারে তো রীতিমতো হাতাহাতি অবস্থা আর কি! গাছ তলায় বসে থাকা এক পাহারাদারের মোলায়েম কথায় বিগলিত হয়ে পাদুকা জিম্মি রেখে মাজার জিয়ারতের পর লম্বা ঝুটিধারী সুদর্শন খাদেমের (পাণ্ডা) পাল্লায় পড়ে মাজারের মধ্যেই নগদ পাচশ টাকা খুইয়ে খাট্টা মেজাজে জুতা নিতে এসে দেখি সে পাহারাদার পাচ টাকার কমে জুতা ছাড়তে নারাজ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে এক বাঙালি ভদ্রলোকের হস্তক্ষেপে একটা রফা হয়েছিল। আর আজমীরে খাজা বাবার মাজারে তো একেবারে কমপিটিশন, টানাটানি ব্যাপার। কে কার পা থেকে কেড়ে নেয় অবস্থা।

এই জুতা পাহারা তেজারতি শুধু যে এ উপমহাদেশে বিদ্যমান তা নয়। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতেও নাকি এর বিস্তৃতি।

যাহোক, কয়েকদিন ইনডিয়ায় অবস্থান করেই বেশ আক্কেল সালামি হয়ে গেল। মসজিদ মাজারে ঢুকলেই দর্শনী তো আছেই, তার উপর জুতা পাহারার গুনাহগারী।

ইনডিয়ায় এসে জয়পুরের পিংক সিটিতে না গেলে নাকি ভ্রমণ অসমাপ্ত থেকে যায়। শেষের দিকে মানে, ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে গেলাম হাতছানি দেয়া সেই সাজানো গোছানো পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন সুন্দর শহরে। সত্যিই মনে রাখার মতো এক অপূর্ব শহর।

সারা দিন ঘুরে–ফিরে গাইডের আহ্বানে দলের কারো কারো আপত্তি সত্ত্বেও মাত্র কয়েকজন মিলে গেলাম বিখ্যাত *বিড়লা মন্দির* দেখতে। অপূর্ব কারুকার্যময় বর্তমানকালের স্থাপত্য শিল্পের সেরা এক নিদর্শন বটে। পাহাড়ের খাজে হেলান দিয়ে থাকা শ্বেত–ধবল ধবধবে বিশাল আকারের সে উজ্জ্বল চকচকে মন্দির। গেট সংলগ্ন ছিমছাম সুন্দর একটি অফিস। সদা হাস্যময় সুন্দরী, চটপটে এক রমণী নরম হাতে জুতাগুলো যত্ন করে দেরাজের খাজে খাজে সাজিয়ে রেখে একটি কার্ড হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। সেখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে মন্দির পর্যন্ত যে রাস্তাটি চলে গেছে তার পুরোটাই কার্পেট জাতীয় বস্তুতে ঢাকা। ধুলো–বালির লেশমাত্র নেই। অনেকটা তাজমহলের অনুকরণে শাদা পাথরে, বিশাল খরচে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি করা হয়েছে বিস্ময়কর সে মন্দির। সত্যি দেখার মতো কীর্তি বটে!

আসলে যে কথাটা বলার জন্য লিখতে বসা, মন্দির দর্শন শেষে ফিরে জুতা নিতে অভ্যাসবশত কার্ডের সঙ্গে টাকা ধরিয়ে দিলে সেই সুন্দরী মহিলাটি এক গাল হাসি ছড়িয়ে শুধু কার্ডটি হাতে নিয়ে কোমল সেই সুন্দর হাতে জুতা জোড়া পায়ের কাছে যত্নের সঙ্গে ফেরত দিয়ে যে কথাটি বলেছিল তা কান, মাথা, শরীরের অণু–পরমাণুতে উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছিল।

নির্ভেজাল হিন্দিতে মাথাটা একটু নিচু করে মোলায়েম ভঙ্গিতে জানিয়েছিল, ইয়ে মসজিদ নেহি হ্যায়, মন্দির হ্যায়। ভগবান কা ঘর হ্যায়। ইস লিয়ে কোই রুপিয়া নেহি লাগতা হ্যায়।

কি অপমানজনক কথা আমাদের জন্য! মহিলা তো জানে না আমরা মুসলমান। কাজেই কথাগুলো আমাদের গায়ে যেন হুল ফুটিয়েছিল।

বিড়লা মন্দিরের হাসি হাসি মুখের সুন্দরী পাদুকা পাহারাদার মহিলার কথাগুলো আজও কষ্ট দেয়, বুকে জ্বালা ধরায়। কেননা দিল্লির নিজামউদ্দিন আউলিয়া যা আজমীরের খাজা মঈনউদ্দিন চিশতির মাজারগুলোতে যে লাখ কোটি টাকা আয়–উপার্জন হয় অনায়াসে সেখানে ইচ্ছা করলে এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিকৃষ্ট মানহানিকর এ পয়সার ব্যবস্থা থেকে দর্শনার্থীদের হয়রানি, টানাটানির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

শুধু মসজিদ, মন্দিরই বা বলি কেন, বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য মোঘল সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি আগ্রার তাজমহলও বাদ যায় কেন? সেখানেও তো অব্যবস্থা বিদ্যমান। পাদুকা পাহারাদারী কারবার নেই বটে তবে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী মূল ফটক পার হয়ে তাজের সম্মুখ ভাগের ফোয়ারা অতিক্রম করে মূল বেদির সিড়িতে পা রাখার আগে জুতা স্যান্ডাল খোলা উন্মুক্ত আকাশের নিচে বেওয়ারিশের মতো ছেড়ে যেতে হয়। ফিরে এসে ছন্নছাড়া এলোমেলো জুতার ভিড়ে খুজে পেতে নিজের দুই পার্টকে একত্র করতে হয়রান, পেরেশানির শেষ থাকে না।

ইনডিয়া সরকারের কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার যেখানে একটা বিরাট আয়ের উৎস সেদিকে কোনো নজর নেই। শুধু কি তাই, তাজমহল সংলগ্ন যে মসজিদ যেখানে এককালে উপমহাদেশের দোর্দণ্ড প্রতাপ মোগল বাদশাহরা নামাজ পড়েছেন, ইবাদত করেছেন, সম্রাট শাহজাহানের সাধের সেই মসজিদের কি করুণ জরাজীর্ণ অবস্থা! চামচিকার বাসা আর মাকড়শার জালে ভরা অবহেলিত এক পোড়া বাড়ি যেন! অথচ এখনো সেখানে পাচ ওয়াক্ত আজান দিয়ে নামাজ হয়।

বিস্ময়কর বিষয় হলো, বংশ পরম্পরায় সেই অতীতকাল থেকে এখন পর্যন্ত বুকে আগলে রেখে যিনি দৈনিক সেবা রেখে চলেছেন সেই মহান ইমাম সাহেবের মাসিক সম্মানী নাকি মাত্র সাড়ে সাইত্রিশ রুপি। বৃটিশ আমল সেখানে এখনো বিদ্যমান! স্বাধীন ইনডিয়ার ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারের মহামান্বিত কীর্তিতে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

রাজশাহী থেকে

মূলধন বিশ্বাস

- সাথী

২০০০ সালের কথা। আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপারটা তখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারিনি। তাই এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার তেমন আগ্রহও ছিল না।

এরই মধ্যে আব্বু আমাকে বাসায় পড়ানোর জন্য একজন টিচার রাখলেন। প্রথম দিন, প্রথম দেখাতেই তাকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তিনি দেখতে যেমনি ছিলেন হ্যান্ডসাম তেমনি স্মার্ট। দিন যতোই যাচ্ছিল, তার প্রতি আমার ভালোবাসা ততোই বাড়ছিল।

এক সময় এমন হলো, তিনি যতোক্ষণ আমাদের বাসায় থাকতেন আমার খুব ভালো লাগতো। যেই চলে যেতেন, আমার মন খুব খারাপ হয়ে যেতো। পরে বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম, এটা নাকি আমার প্রেমে পড়ার লক্ষণ।

প্রেম কি না জানি না। তবে তাকে আমার ভীষণ ভালো লাগতো।

আমার ভালো লাগা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো, তিনি কিছুই জানলেন না, কিছুই বুঝলেন না।

বান্ধবীরা আমাকে বুদ্ধি দিল তাকে আমার মনের কথা, আমার ভালো লাগার কথা খুলে বলতে।

আমি সাহস পেলাম না। তিনি যদি আমাকে ফিরিয়ে দেন?

অবশ্য আমি দেখতে ততোটা খারাপ ছিলাম না। বান্ধবীদের ভাষায় সুন্দরী ছিলাম। তারা আমাকে আশ্বস্ত করলো এই বলে যে, তিনি তোকে কখনোই ফেরাবেন না।

বান্ধবীদের উৎসাহে, আগ-পাছ না ভেবেই একদিন একটি চিরকুটের মাধ্যমে আমার মনের কথা জানিয়ে দিলাম। এরপর দুই একদিন আর লজ্জায় তার সামনে আসতে পারিনি।

তার দুই তিন পর সে একটি কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিল। তাতে সে লিখেছিল, সেও আমাকে ভালোবাসে।

লেখাটা পড়ে সেদিন খুশিতে কেদেছিলাম। কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে, এতো সহজেই তার মন পাবো।

যাক, এভাবেই শুরু হলো আমার প্রেমের জীবন।

প্রথম প্রথম সম্পর্কটা চিঠি দেয়া–নেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর দেখা–সাক্ষাৎ তো আমাদের মধ্যে হতোই। কারণ তিনি প্রতিদিন আমাকে পড়াতে আসতেন।

এরপর আস্তে আস্তে স্কুল ফাকি দিয়ে তার বাসায় যাওয়া শুরু করলাম। সময় পেলেই আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি ঢাকা শহরের আনাচে–কানাচে। আমার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে তাকে ভালোবাসলাম। সেও আমাকে খুব ভালোবেসেছে। এতো গভীর সম্পর্কের পরও কেন জানি আমার মনে হতো সে যদি আমাকে ফাকি দেয়, আমাকে বিয়ে না করে!

সে তখন আমাকে আশ্বস্ত করে বলতো, ভালোবাসার মূলধন বিশ্বাস। কাজেই আমি যেন তার ওপর বিশ্বাস না হারাই।

আমিও মেনে নিতাম তার কথা।

এভাবে সুখেই কাটছিল আমাদের দিনগুলো। প্রতিটা দিন আমার কাছে মনে হতো রঙিন। আমরা দুজন দুজনকে খুব ভালো করে বুঝতে পারতাম।

এরই মধ্যে একদিন আমার মা আমাদের সম্পর্কের কথা জেনে গেলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

স্বীকার করলাম সব কিছু।

তিনি আমাকে বারণ কররেন এই সম্পর্ক রাখতে।

মাকে জানালাম, এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এর পরদিন তিনি আমার জান, আমার ভালোবাসাকে অপমান করলেন।

সে আমাদের বাসায় আর এলো না। কিন্তু আমরা পালিয়ে বাইরে ঠিকই দেখা করতাম।

আমার মা ছাড়া আমাদের ফ্যামিলির সবাই আমাদের সম্পর্কটা মেনে নিয়েছিল। মায়ের কথা ছিল, ছেলে ভালো কিন্তু বেকার। মা তাকে কোনো সুযোগ দিতেও রাজি নন।

আমার মা এমন কোনো চেষ্টা বাদ রাখেননি আমাদের এই সম্পর্কটা নষ্ট করতে। তিনি আমার গায়ে হাতও তুলেছিলেন যা আগে কখনোই করেননি। তিনি আমাকে অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করলেন। মাকে বলেছিলাম, বিয়ে করতেই হয়, আমার জানকে করবো, অন্য কাউকে নয়। প্রয়োজনে আমার জীবন দিয়ে দেবো।

আমার এই চরম বিপদের দিনেও আমার জান আমাকে আগলে রেখেছিল, আমাকে সাহস যুগিয়েছিল।

যাই হোক। এতো ঘটনার পরেও ২০০৩ সালে আমার মায়ের অমতেই আমার জানের সঙ্গে বিয়ে হলো। মা ছাড়া সবাই ছিলেন বিয়েতে।

আজ আমাদের বিয়ের দুই বছর হতে চললো। অথচ আমাদের একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা একটুও কমেনি। বরং মনে হয়, যতোই দিন যাচ্ছে, আমাদের ভালোবাসার গভীরতাও ততো বাড়ছে।

আজ আমি জগতের সুখী মানুষদের একজন। আমার জানকে নিয়ে খুবই সুখে আছি।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

কোথাও কেউ নেই

– কামরুল হাসান

লাস পালামোস এভিনিউতে তার সঙ্গে আমার দেখা। রাস্তার ওপারের শিখের দোকান থেকে টুকটাক কিছু কিনেছি। দহিবড়া সমুচার সঙ্গে একটা ঘুগনির প্যাকেট।

সুন্দর ঝকঝকে সোনালি রোদ। এখনো বাতাস ততোটা তপ্ত হয়ে ওঠেনি। চকচকে নীল আকাশ। ঝির ঝির হাওয়া বইছে। বাস ধরবো বলে স্টপেজে এসে দাড়ালাম। বেশ বড়সড়ো ঝাকড়া ছায়াবীথি একটা গাছের নিচে কাঠের বেঞ্চ। আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। বাসের দেরি দেখে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। তখনই তার সঙ্গে চোখাচোখি হলো।

ঠোটের কোণে একটু হাসি টেনে বললেন, হাই।

আমিও হাই বলে একটু নরম হাসলাম।

আবারও তিনি চোখ ঘুরিয়ে একটু হাসলেন।

খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, হানি, তোমার সঙ্গে কি একটু কথা বলতে পারি?

বিচলিত হয়ে বললাম, অবশ্যই, কেন নয়?

আমার নাম ক্যাথি জোন্স। হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য।

ক্যাথি হালকা ফিরোজা কালারের গাউন পরেছেন। কানে দুটো শাদা পার্ল। শাদা চুলের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে। ঠোটে গাঢ় মেরুন লিপস্টিক যেটা আমেরিকান বৃদ্ধাদের একটি কমন ব্যাপার। যুবতী বয়সে যিনি কখনোই রুজ লিপস্টিক ব্যবহার করেননি তিনিও বৃদ্ধা বয়সে বেশ যত্ন সহকারেই এ কাজটি করেন। হয়তো বা ব্যাপারটি প্রাকৃতিক। যৌবনে সমস্ত শরীর জুড়ে এতো কিছু সুন্দরের সমাহার সেখানে কৃত্রিম কিছুর ব্যবহারের প্রয়োজন সীমিত। এমনকি সব প্রসাধনকে সযত্নে অবহেলাও করা যায়। কিন্তু বৃদ্ধা বয়সে আমেরিকার অত্যন্ত বেখেয়ালি অগোছালো মেয়েটিও যত্নশীল হয়ে ওঠে তার পোশাক–আশাক, প্রসাধন আর অলংকারাদি নিয়ে। ব্যাপারটি যদি এই হয় তাহলে মিস ক্যাথিই বা বাদ যাবেন কেন!

তোমাদের এশিয়ানদের একটি বিশেষ কারণে খুব শ্রদ্ধা করি। এভাবেই তিনি কথা শুরু করলেন।

তোমাদের আছে অটুট এবং দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন। খুব সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, এই বিত্তশালী দেশের কোথাও সেটা খুজে পাবে না। একটা বয়সে আমরা বড় অসহায় এবং একাকী। সব থেকেও কিছুই নেই। বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। আমি তো রক্ত মাংসের মানুষ; রকেট তো নেই! এ আমার কথাই ধরো। আমার চারটি ছেলে–মেয়ে। তারা সবাই এখন নিজেদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। একদিন ছিলাম পরিবারের প্রধান, সমস্ত ডিসিশন মেকার। সব সিদ্ধান্ত আমিই দিতাম। আস্তে আস্তে এবং একে একে সবাই আমাকে ছেড়ে গেল। বিশাল বাড়িতে কি করে একা থাকবো ভেবে বাড়িটি বেচে একটি অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছি। দুই কামরার ছোট্ট একটা বাসা। বিকেলে নিরিবিলি একটু বারান্দায় বসতে পারি না। প্রতিবেশী বাচ্চারা এতো বেশি চিৎকার, চেচামেচি করে, কি বলবো!

সপ্তাহান্তে আমার মেয়ে আমাকে দেখতে আসে। সে বলে, মা, তুমি সুপার–এর কাছে কমপ্লেইন করো না কেন?

বলেছি, তোমরা তো বলেই খালাস। আমি এখানে একা থাকি। এরপর যদি তারা আমাকে আরো বিরক্ত করে তখন ব্যাপারটা কেমন হবে। কিছু মনে করো না। তোমার অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। জানো হয়তো, আমার মতো বৃদ্ধাদের থেকে সবাই দূরে থাকে। কথা বলতে চায় না। আমি অবশ্য ইয়ংদের দোষ দিই না। আজকাল জীবন জটিল হয়ে গেছে। তারা লেখাপড়া, চাকরি এবং নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের সময়ই বা কোথায়। তবুও মন মানে না। মনে হয় কেউ যদি একটু কুশল জিজ্ঞাসা করতো, একটু সঙ্গ দিতো?

বাস চলে এলো।

বললাম, মাম, তোমাকে কি একটু সাহায্য করবো?

পরিতৃপ্তির হাসি দিয়ে মিস ক্যাথি বললেন, থ্যাংক ইউ হানি। আমার বয়স নব্বই। এখনো চশমা পরতে হয় না। এবং একাই চলাফেরা করতে পারি। শুধু খারাপ লাগে, একদিন আমি ডিসিশন মেকার ছিলাম। কিন্তু

এখন আমার ডিসিশনের কোনো দাম নেই। কেউ দাম দেয় না। চারদিকে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। আমি খুব একা। নিঃসঙ্গ। শেষ শরতের বিবর্ণ পাতা হয়ে ঝরে যাবার দিন গুণছি।

বলতে বলতে তার চোখের কোণায় জলে ভরে গেল।

আমার হাতে হাত রেখে অনুনয় করে বললেন, হানি, আমাদের কি আবারও কখনো দেখা হবে? হয়তো নয়। তবে জেনে রেখো, আজ এই বসন্ত দিনের দুপুরে তুমি যে আমাকে অনেকটা সময় দিলে, আমাকে সঙ্গ দিলে, এটা চার্চে দুই ঘণ্টা কাটানোর চেয়েও অনেক পুণ্যময়। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক। গুডবাই।

টরন্টো থেকে
quamrulhassan@hotmail.com

অভিনয়

- রোখসানা পারভীন নীপা

হাসপাতালের অদূরে বৃদ্ধ শীর্ণ লোকটি অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।

তখন উপস্থিত লোকজন লোকটিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলো।

কর্তব্যরত ডাক্তার যথাসম্ভব চেষ্টা করলো বৃদ্ধ লোকটির জন্য। ডাক্তারের অক্লান্ত চেষ্টায় লোকটির জ্ঞান ফিরে এলেও ডাক্তার বুঝতে পারলেন বৃদ্ধ লোকটির অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে।

বৃদ্ধ লোকটি কেমন যেন ঘোর লাগা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন আর কি যেন খুজে বেড়াচ্ছেন।

বৃদ্ধ লোকটি যেহেতু পরিচিত ছিল না, তাই অনুসন্ধান চালিয়ে তারা পাঞ্জাবির পকেটে একটি চিঠি পাওয়া গেল।

চিঠি থেকে শুধু এটুকু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা গেল যে, বৃদ্ধ লোকটির একমাত্র ছেলে সেনাবাহিনীতে কর্মরত।

বাইরে এসে বৃদ্ধের ছেলেকে দ্রুত কিভাবে খবর দেয়া যায়, এই চিন্তায় ডাক্তার যখন কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও অন্য মনস্ক তখন দেখতে পেলেন সেনাবাহিনীর পোশাক পরে একটি লোক বারান্দা দিয়ে হেটে আসছেন। ডাক্তার ছুটে গিয়ে লোকটির হাত ধরে, আপনার বাবার অবস্থা খুব খারাপ যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এই বলে লোকটিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে টেনে অসুস্থ বৃদ্ধ লোকটির সামনে হাজির করলেন।

সেনাবাহিনীর পোশাক পরা লোকটিকে দেখে বৃদ্ধের ঘোর লাগা অপ্রকৃতস্থ চোখে মুখে আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়লো। পরম শান্তির ভাব তার চেহারায় ফুটে উঠলো। পরম নির্ভরতায় বৃদ্ধ তার হাত দুটো লোকটির হাতে রাখলেন এবং এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ লোকটি তার অবশিষ্ট দৃষ্টির স্বচ্ছতাও হারালেন। তিনি মারা গেলেন।

আপনার বাবার পকেটে এই চিঠিটি পাওয়া গেছে, বলে সেনাবাহিনীর পোশাক পরা লোকটির হাতে বৃদ্ধের পকেটে পাওয়া চিঠিটা ডাক্তার দিলেন।

লোকটি চিঠিটা পড়লেন মনোযোগ সহকারে। পড়ে উঠে দাড়ালেন। বললেন, তিনি আমার বাবা নন।

মানে? ডাক্তার বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন!

তখন লোকটি বললেন, আপনি যখন আমাকে আপনার বাবার অবস্থা খুব খারাপ, এসব বলে কিছু না বলার সুযোগ দিয়ে টেনে এখানে বৃদ্ধের কাছে নিয়ে এলেন তখন কিছু একটা আচ করতে পেরে চুপ করে ছিলাম। বৃদ্ধকে দেখে আমিও বুঝতে পেরেছিলাম যে, তার সময় আসন্ন। বৃদ্ধ লোকটি যখন আমাকে দেখে শান্তি পেলেন এবং নির্ভরতায় হাত আকড়ে ধরলেন তখন ইচ্ছা করেই তাকে কিছু বলিনি। আসলে চিঠি পড়ে বুঝতে পারছি লোকটি অন্তিম মুহূর্তে ঘোরের মধ্যে আমাকেই তার ছেলে বলে ভুল করেছেন। হয়তো তার ছেলের সঙ্গে আমার চেহারার কিছু মিল থাকতে পারে কাকতালীয়ভাবে। তাছাড়া সেনাবাহিনীর পোশাক পরা অবস্থায় সবাইকে প্রায় এক রকম দেখায়। তাই প্রথম দিকে সব না বুঝলেও কিছুটা আচ করতে পেরে বৃদ্ধের ভুল

ভাঙাইনি। এখন বুঝতে পারছি বৃদ্ধ লোকটি আমাকেই তার প্রিয়জন ভেবে মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে শান্তি পেয়েছেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরলোকগমন করেছেন। এতে করে বিদেহী আত্মাও শান্তি পাবে।

এসব বলে ডাক্তারের সঙ্গে সেনাবাহিনীর পোশাক পরা লোকটি করমর্দন করে চলে গেলেন।

ডাক্তারও অবাক হয়ে ভাবলেন, মাঝে মধ্যে মিথ্যা বলা বা মিথ্যা অভিনয় ন্যয়সঙ্গত হতে পারে যদি তা মানুষের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে।

বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে

ভাগলপুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ থেকে

পাসপোর্ট

- জসিম উদ্দিন

বিদেশ আসবো এই জাতীয় স্বপ্ন খুব কম দেখতাম। কেননা পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। এরই মধ্যে সেজভাইয়ের বন্ধু একটি আর্টিস্ট–এর ভিসা নিয়ে এলেন। ভাই বিদেশ আসার জন্য প্রায় উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক সাহায্য কে করবেন?

মনির আর্টের মনিরভাই, খালু আবদুল খালেক এবং আরো অনেক লোকের সহযোগিতায় ভাই বিদেশ গেলেন। যাওয়ার দুই বছরের মধ্যে আমার জন্য একটি ভিসা পাঠালেন। ভিসা পেয়ে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, আমিও বিদেশে যাবো! তবে মনটা একেবারে ছোট হয়ে গেল এই ভেবে, সকল আপনজন, এমনকি আমার মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে হবে।

যাই হোক। প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেল। প্রথমে ভিসার বাংলা অনুবাদ করার জন্য বের হলাম। অনুবাদ শোনার পর মনে হলো আকাশটা ভেঙে মাথায় পড়লো। মাত্র বিয়াল্লিশ দিন ভিসার মেয়াদ।

এবার শুরু হলো পাসপোর্ট তৈরি করার পালা। একুশ দিনে একটি পাসপোর্ট আনা যায় এগারো বারোশ টাকা বিনিময়ে। চিন্তা করলাম, আরো একটু তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট বের করবো। একটু বেশি টাকা লাগবে।

সমস্যা হলো যখন পাসপোর্ট অফিসের মাঠে নামলাম। সময়টা এখনো মনে আছে। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার চার পাচ মাসের মধ্যে এই ঘটনা।

বিশ্বাস হচ্ছে না ব্যাপারটা। পা রাখার জায়গা নেই, এতো মানুষের ভিড়! পরে জানতে পারলাম পাসপোর্ট সীমিত। যাদের ভিসার সময় খুব অল্প দিন বাকি একমাত্র তাদেরকে পাসপোর্ট দেয়া হবে। দেখলাম এ জাতীয় লোকের সংখ্যা অনেক বেশি এবং তাদের সারিতে আমিও একজন। অনেকে আশা ছেড়ে দিয়েছে, বিদেশ যাওয়া আর হবে না। নতুন নিয়মও শুরু হলো একটা। ভিসার ফটো কপি ডিসি–র কাছ থেকে সিল এবং সই করিয়ে আনতে হবে।

এবার শুরু হয়ে গেল ডিসি অফিসে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। এখানেও একই অবস্থা। মানুষ আর মানুষ।

প্রতিদিন সকালবেলা আমিসহ বড়ভাই এবং মেজভাই একত্রে ডিসি অফিসে অনেক দিন গিয়েছি। কিন্তু ডিসির রুমে প্রবেশ করা কোনোদিন হয়ে উঠেনি। পাসপোর্ট পাওয়া যাবে সেই রকম লক্ষণ দেখছি না। এ দিকে ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার মাত্র কিছু দিন বাকি।

ঘুম, খাওয়া নেই বললেই চলে। আশা ছেড়ে দিলাম, আমার আর বিদেশ যাওয়া হবে না। চোখের সামনে দেখেছি যাদের মামা, কাকা আছেন তাদের পাসপোর্ট অফিস থেকে পাসপোর্ট নিয়ে আসতে। তাদের জন্য কোনো নিয়ম–নীতির প্রয়োজন হয় না।

কথায় আছে, *হাল ছেড়ো না বন্ধু*। চেষ্টা আরো বেশি শুরু করলাম।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বড়ভাইয়ের বন্ধু রনিভাইয়ের সঙ্গে দেখা ডিসি অফিসে। রনিভাইকে বিস্তারিত খুলে জানানো হলো।

রনিভাই বললেন, এটা কোনো ব্যাপারই না, আমি পাচ ছয় দিনের মধ্যে পাসপোর্ট তোমার বাসায় পৌছে দেবো। তবে প্রথমে তাকে দিতে হবে দশ হাজার টাকা।

দুই দিন পর বাসায় এসে রনিভাই হাজির। কি ব্যাপার রনিভাই?

আরো দশ হাজার দিতে হবে।

তাই দিলাম তাকে। আরো দশ হাজার। সর্বমোট বিশ হাজার।

এরপর দিন ফোন করলাম তার মোবাইলে।

সে পাসপোর্ট অফিসে আমাকে আসার জন্য বললে, তার সঙ্গে দেখা করলাম।

রনিভাই বললেন, আরো পাচ হাজার লাগবে।

উপায় নেই। আবারও দিলাম পাচ হাজার।

দেয়ার পর বললেন, তুমি অপেক্ষা করো কিছুক্ষণ পরে তোমার পাসপোর্ট আসবে।

অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই অপেক্ষার প্রতিটি সেকেন্ড যে কতো কষ্টের!

যাই হোক। এক সময়ে রনিভাই এনো। বললেন, পিয়নকে কিছু দিতে হবে। না দিলে আজকে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে না।

পিয়নকে ছয়শ টাকা দিতে হলো।

সঙ্গে সঙ্গে হাতে আমার পাসপোর্ট পেলাম। টাকাগুলো যে কতো কষ্ট করে সংগ্রহ করেছি তো একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন।

পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার পর একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু এ ঘটনাটা মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত মনে রাখবো।

আভা, সউদি আরব থেকে

মিসেস লি

– সাত্তার

১৯৮৩ সাল। লি কোয়াংয়ু এবং ছোট ভাই লি কোয়াং মিন। বয়স যথাক্রমে চার এবং তিন। বাবা মি. লি একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করেন।

সেদিন ছিল রবিবার। মি. লি কোং সহকর্মীদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাওয়ার প্রোগ্রাম করা ছিল সপ্তাহের প্রথমে। সকালে ঘুম থেকে উঠে নাশতা সেরে মাছ ধরার সরঞ্জাম গুছিয়ে দেয়ার জন্য মিসেস লিকে তাগাদা দিচ্ছিল বার বার। যাওয়ার সময় ছেলে দুটিকে কাছে ডেকে নিয়ে আদর করে বলেছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি মাছ ধরে ফিরে আসছি, রাতে সবাই তাজা মাছ দিয়ে এক সঙ্গে ভাত খাবো।

পাহাড়ি ঝরনায় বয়ে যাওয়া স্রোতে সহকর্মীদের সঙ্গে মাছ ধরছিলেন মি. লি মহা আনন্দে। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান এবং দুর্ভাগ্যবশত মাথাটা গিয়ে পড়ে একটা পাথরের ওপর। দ্রুত রক্তক্ষরণের ফলে হাসপাতালে নিতে নিতে পথিমধ্যে মারা যান মি. লি।

বাবার একমাত্র আয়ে লি কোয়াংয়ুদের পরিবার খুব অনন্দে চলছিল। মিসেস লি তার বাবার অমতে বিয়ে করায় বাবার বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না।

স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারে অভাব নামের দানবের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। ছেলে দুটিকে নিয়ে বাবার বাড়ি চলে আসেন। বাবার অমতে নিজে বিয়ে করেছিলেন বলে ছেলে দুটিকে তার বাড়িতে রাখতে এবং তাদের ভরণ–পোষণ করাতে তিনি অমত পোষণ করেন।

মিসেস লি অনেক কাকুতি–মিনতি করেও তার মন গলাতে পারেন না। অবশেষে মাত্র কয়েকদিনের জন্য বাবার বাড়িতে থাকার অনুমতি পান একটা কাজ যোগাড় করে অন্যত্র চলে যাওয়ার শর্তে।

কাজ যোগাড় করাটা ছিল ওই সময় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক খোজাখুজির পর একটা কাজ পান গৃহপরিচালিকার। সারা দিন কাজ করে রাতে ফেরার সময় সারা দিনের খাবার নিয়ে ঘরে এসে সন্তান দুটিকে নিয়ে এক সঙ্গে খেতেন। এভাবে কেটে যায়। বাবার বাড়িতে থাকার ঘরটুকু ছাড়া অন্য কোনো সাহায্য তিনি পাননি। এভাবে কষ্টে কেটে যায় কয়েক মাস।

মিসেস লি–র ননদ খবর পেয়ে দেখা করতে আসে কয়েক মাস পর। মিসেস লি–র কাছে সমস্ত কথা শুনে তাকে পরামর্শ দেয়, ছেলে দুটিকে যদি মানুষ করতে চাও তাহলে কোনো ধনী দেশে পালক পাঠিয়ে দাও। সেখানে তারা উন্নত পরিবেশে কোনো সন্তানহীন দম্পতির কাছে মা বাবার আদর–স্নেহে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে তোমার কাছে রাখলে না পারবে লেখাপড়া করাতে, না পারবে ঠিক মতো পেট ভরে খাওয়াতে।

মিসেস লি এই প্রস্তাব শুনে ননদকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। বলেন, শত কষ্ট হলেও আমার সন্তানদের ছাড়বো না, মরে গেলেও না।

মায়ের কাছে সন্তান সব কিছুর ঊর্ধে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অভাব নামের দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে ওঠেন না মিসেস লি। অনাহারে, অর্ধাহারে নিজের শরীর ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছিল। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েন মিসেস লি। সন্তান দুটি ক্ষিধের যন্ত্রণায় মাকে জ্বালাতন করতে থাকে।

ছেলেদের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ শরীরে নিয়ে বাবার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মায়ের কাছে যান গোপনে কিছু খাবার আনতে। খাবার নিয়ে ফিরে আসার সময় বাবার সামনে পড়ে যান।

বাবা বিভিন্নভাবে গালাগালি ও অপমান করে তার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

উপায়ান্তর না পেয়ে মিসেস লি তার ননদকে আবার খবর পাঠান। খবর পেয়ে ননদ দ্রুত চলে আসে এবং মিসেস লি ও সন্তানদের অবস্থা দেখে অভিমানে অনেক বকাঝকা করে ভাবীকে।

দ্রুত ব্যবস্থা করার কথা জানান তার ভাবী আমেরিকায় কোনো সন্তানহীন পরিবারের পালিত পাঠানোর জন্য। ওই সময় কোরিয়ায় একটা ধর্মীয় সংস্থা গরিব অনাথ শিশুদের ধনী দেশে সন্তানহীন পরিবারে পালিত পাঠানোর কাজ করতো।

বিদায়ের দিন মিসেস লি তার শেষ সম্বল, তার স্বামীর শেষ স্মৃতি বিয়ের আংটি বিক্রি করে সন্তানদেরকে নতুন জামা–প্যান্ট এবং খেলনা কিনে দেন। এয়ারপোর্টে একটা ওয়েটিং রুমে ছেলেদের বসিয়ে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন বাবা, তোরা এখানে একটু বস, আমি আরো খেলনা কিনে নিয়ে আসি। এভাবে বিদায় নিয়ে আড়ালে এসে ছটফট করেন। হাউমাউ করে কেদেছিলেন সেদিন। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে আশপাশের অনেকের চোখে পানি এসেছিল।

২০০৪ সাল। লি কোয়াংয়ু আটাশ বছরের যুবক। আমেরিকায় মোটামুটি একটি সচ্ছল পরিবারের পালক মা–বাবার কাছে মানুষ হয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। অভাব নামের কোনো কিছুই কখনো তাদের পাশে আসতে পারেনি। তারা দুই ভাই আমেরিকায় আসার সময় যে পোশাক, জুতা এবং খেলনা নিয়ে এসেছিল সেই পোশাক, জুতা, খেলনা যত্ন করে রেখে দিয়েছিল তাদের নতুন পালক পিতা–মাতা তাদের প্রকৃত পিতামাতার স্মৃতি হিসেবে। মাঝে মধ্যে ওইগুলো ছেলেদের সামনে দিয়ে কোরিয়াতে রেখে আশা মায়ের কথা

জানাতে চাইতো যাতে সে জন্মদানকারী মায়ের কথা ভুলে না যায়। পালক মা–বাবা এদের শিশু মনেই তাদের মায়ের কথা, মায়ের স্মৃতি জীবন্ত করে রেখেছিল।

লি কোয়াংয়ু মেধাবী এবং স্পোর্টস প্রিয় ছিল। ব্যক্তিগতভাবে মার্শাল আর্ট শিক্ষা নিয়েছিল। ছাব্বিশ বছর বয়সে মার্শাল আট ক্যাম্পিং–এ কোরিয়াতে এসেছিল লি কোয়াংয়ু। তখন মাকে খুজেছিল অনেক। কিন্তু ভাষা অজানা লি কোয়াংয়ু পক্ষে মাকে খুজে বের করাটা ছিল খুবই অসম্ভব। ক্যাম্পিংয়ের সময় শেষ হওয়ায় জন্মভূমি, মাকে ফেলে এক বুক অপেক্ষা, মায়ের স্মৃতি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। কিন্তু মাকে খুজে বের করার আকাঙ্ক্ষা দিন দিন অস্থির থেকে অস্থিরতর করে তুলছিল।

২০০৪ সালের প্রথম দিকে *এমবিসি টিভি সেন্টার* নতুন একটা প্রোগ্রাম চালু করে যার নাম দেয়া হয় *ফোক হান বোন ফোগোশিপপো*। বাংলা অর্থ, *অবশ্যই একবার দেখতে ইচ্ছা করে*। এই অনুষ্ঠানের মূল কাজ হলো হারিয়ে যাওয়া স্বজন বন্ধুবান্ধবী, প্রিয়জনদের খুজে বের করে দেয়া। সে পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকুক না কেন, এরা শতকরা একশ ভাগ চেষ্টা করে খুজে বের করার জন্য।

অনুষ্ঠানের উপস্থাপক লি কোয়াংয়ুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এতো বছর পর কেন সে মাকে খুজছে? খুজে পেলে মায়ের ওপর রাগ, ঘৃণা এগুলো প্রকাশ করবে কি না?

উত্তরে সে বলেছিল, তিনি আমার জন্মদাত্রী মা, তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসার কোনো কমতি নেই এই হৃদয়ে। যে মা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, এই সুন্দর পৃথিবীর মুখ দেখতে সাহায্য করেছেন তার মুখচ্ছবি কেমন? তার যে স্মৃতি আমাদের বুকে আছে তার দেয়া শেষ উপহার খেলনা, পোশাক দেখি আর বুকের ভেতর এক ধরনের ব্যথা অনুভব করি। এটাই কি তার প্রতি ভালোবাসা নয়? শুধু তার সঙ্গে একবার মিলিত হতে চাই, আর কোনো চাওয়া নেই।

মিসেস লি গত আটাশ বছরের তেইশ বছরই একাকী জীবন যাপন করেছেন। একটা বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে নিচু কাজ করেছেন। গত পাচ বছর আগে আবার বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করেছেন।

মিসেস লি সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সে এক আনন্দঘন, হৃদয়বিদারক দৃশ্য। চব্বিশ বছর পর সন্তানদের ফিরে পেয়ে বার বার মূর্ছা যাচ্ছিলেন মিসেস লি।

কোরিয়া থেকে
st120871@yahoo.com

পাঞ্জাবি অতঃপর

- সুলতান আহমেদ

১৯৫৯ সাল। আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। যে সন্ধ্যা রাতে আমি ধারত্রীর রূপ, রস, শব্দ, বর্ণ গন্ধের সংস্পর্শে এলাম সেই একই ভোরে আমাদের গাভীটি বাচ্চা প্রসব করলো। প্রতিবেশী স্বজন সকলেই মায়ের নাম ধরে নাকি বলেছিল, তার ছেলে দুধ সঙ্গে করে এনেছে। বড়ই ভাগ্যবান ছেলে।

আমি মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের চতুর্থ সন্তান, মেজছেলে। বাড়িতে ধানের গোলা, ডাল–সরিষার জন্য আরো একটি, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, ঘাটে বড় একটি নৌকা ভাড়া খাটে, বাবার র‍্যালে সাইকেল। বৈঠকখানায় সর্বদা লোকজনের সমাগম হতো।

বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে।

মা–বাবা আর চার ভাইয়ের সুখের সংসার।

আমার জন্মের বছর কয়েক আগে সাত বিঘার একখানি জমি কিনেছিলেন বাবা। দাতা দুই ভাইয়ের মধ্যে নিঃসন্তান বড় ভাই হেতু তার মৃত্যুর পর সকল সম্পত্তি পাবে ছোট ভাই। বাবাকে বোঝানো হয়েছিল, ছোট

ভাই রেজিস্ট্ করে দিলে আর বড় ভাই সাক্ষী থাকলে কোনো সমস্যা নেই। বাবা জমি রেজিস্ট্ করে খাজনা, দাখিলা, নামপত্তন সব করে জমি ভোগ করতে লাগলেন। আমার জন্মের বছর দুই পরে সেই বড় কাকা এবং আরো বছরখানেক পরে সেই ছোট কাকা স্বর্গে আরোহণ করলেন। পিতৃ শ্রাদ্ধান্তে ছোট কাকার সুযোগ্য সন্তানেরা জেঠার সব সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকারী দাবি করে আইনের আশ্রয় নিলেন। মুন্সেফ কোর্টে, উকিলের সঙ্গে তারিখ হেরফের করে তারা একতরফা রায় পেয়ে যায়। জজ কোর্টে দীর্ঘ শুনানি ও যথাযথ সাক্ষী থাকার পরও প্রমাণিত হলো না যে, বড়ভাই সম্পত্তি বিক্রয় করেছেন। ইতিমধ্যে বাবার যা ছিল তা সবই একে একে খোয়া গেল।

আমরা চার ভাই সকলেই ছাত্র। বই–খাতা, কাগজ–কলম, সংসার ইত্যাদি নিয়ে মা–বাবার ত্রিশংকু অবস্থা। বাবা একটি গামছা পরেন ও একটি গায়ে দেন। শীতেও একই অবস্থা। কোনো গরম কাপড় নেই। জমি–জমা যা যৎসামান্য আছে তাতে কিছুই হয় না।

তদানীন্তন সাতক্ষীরা মহকুমায় প্রচুর আখের চাষ হতো এবং দেশি পদ্ধতিতে চিনি তৈরি হতো। দাদার খেজুর গুড়ের চিনির কারখানা ছিল। তাই বাবা খেজুর ও আখের গুড়ের চিনি তৈরির ওস্তাদ পশারি এবং কাপড় বোনার কাজে ব্যবহৃত সানা তৈরির পেশা বেছে নিলেন। দিনে চিনির কারখানা চালাতেন, রাতে সানা তৈরি করতেন। সেদিন সানা বিক্রির জন্য হাটে যেতেন, সে সময়টুকু চিনির কারখানা আমি দেখাশোনা করতাম।

এ অবস্থায় গ্রামের দিন আনা, দিন খাওয়া মানুষের মতো আমাদেরও ঈদ আসতো, চলেও যেতো। স্কুলের পোশাক দিয়েই ঈদ হতো আমাদের।

বাবার গায়ে দেয়ার কিছুই নেই। কয়েক মাস আগেই সিদ্ধান্ত নিলাম মায়ের কাছ থেকে মাঝে মধ্যে যে দুই চার পয়সা বাদাম খাওয়ার জন্য নিয়ে থাকি তা জমাবো।

রোজার শুরুতে দেখা গেল তিন টাকার মতো জমেছে। বাবার একটি পাঞ্জাবি সেলাইসহ দুই টাকা দশ আনা পড়বে। ওই পয়সায় বাবার একটি পাঞ্জাবি ও ছোট দুই ভাইয়ের দুটি টুপি হলো। ঈদের আগের রাতে মাকে সব বুঝিয়ে দিলাম।

ঈদের দিন ভোরে চুল কাটিয়ে, সাবান মেখে গোসল করে, জামা–কাপড় পরে, আতর মেখে তৈরি হলাম। ছোট ভাইয়েরা অন্য ছেলেদের সঙ্গে ঈদগাহে চলে গেল।

বাবার গোসল হলে মা পাঞ্জাবি দিয়ে বললেন, এটা পরে নামাজ পড়তে যাও।

টাকা কোথায় পেলে?

মেজখোকা বাদামের পয়সা জমিয়ে তোমার জন্য পাঞ্জাবি এনেছে।

ছেলেরা পুরনো কাপড় পরে নামাজ পড়তে যাবে সে কথা ভেবেই হয়তো তিনি আমার একটি পিঠ ছেড়া শার্ট পরে নামাজে গেলেন। দুঃখে নামাজে না গিয়ে উঠানের পাশে বেশ বড় একটি জামরুল গাছে উঠে বসে থাকলাম।

মা বুঝেছিলেন দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু এটা ভাবেনি যে, নামাজ পড়তে যাবো না।

নামাজ থেকে ফিরে বাবা আমাকে খুজলেন।

মা বললেন, কেন ঈদগাহে যাইনি।

জামরুল গাছটি উঠানের পাশে এমনই জায়গায় যেখানে সচরাচর যাওয়া হয় না। কিন্তু বাড়ির সব কথাই মোটামুটি শোনা যায়।

সবাই আমাকে খুজতে শুরু করলো।

দেখলাম বাবা পাঞ্জাবি পরে আমাকে খুজলেন।

গাছের পাতার মধ্যে বসে ভাবছি কি করবো।

এমন সময়ে দেখি ছোট ভাইটা গুড়িগুড়ি গাছের নিচে এসে বলছে, আমি ওই পাশ থেকে আতরের গন্ধ পেয়েছি মেজভাই।

তার কথা শুনে বাবা এসে বললেন, তোমার পাঞ্জাবি পরেছি, নিচে নেমে এসো।

নিচে নেমে বাবার পা ছুয়ে সালাম করতেই তিনি বুকে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি যে আমার বাবা হয়ে এসেছো বুঝতে পারিনি। আর ঝর ঝর করে কয়েক ফোটা অশ্রু ঝরে পড়লো আমার মাথায়, পিঠে।

আমিও নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না।

আমার জীবনে এতো আনন্দের ঈদ আর কোনোদিন আসেনি। সে আনন্দ এখনো জীবন্ত।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

জানালা

- সাগর

গত রমজান মাস থেকেই জানালা দিয়ে তার সঙ্গে ইয়ার্কি মারা শুরু। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে বাড়ির কাছেই কোচিং করার ফলে পড়াশোনার পাশাপাশি হাতে ছিল অফুরন্ত অবসর।

রোজার মাসের বারোতম রোজাটি আমি রাখিনি। আমার রুমে জানালার কাছে বসে কি যেন খাচ্ছিলাম।

আমারদের বাড়ি তিন তলা। হঠাৎ দেখি আমার জানালার সোজা দোতলা বাড়ির ছাদে ষোল সতেরো বছরের একটি মেয়ে বসে আছে। আমার খাওয়া দেখে সেও দৌড়ে নিচে গিয়ে কি যেন নিয়ে এসে খাওয়া আরম্ভ করলো।

আমি যখন পানি খেলাম, সেও পানি খেলো।

বেশ মজাই লাগলো। এবং এভাবেই শুরু হলো।

এরপর থেকে নিয়মিতই তার সঙ্গে জানালা দিয়ে ইয়ার্কি মারা এবং অঙ্গভঙ্গি করে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলাম। অবশ্য সরাসরি কথা বলতাম ঠিকই কিন্তু সেটা রাত একটা কিংবা দুইটার পরে। বাসার এবং পাড়ার লোক যখন গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতো তখনই আমরা দুইজন জানালায় বসে বসে চিৎকার করে কথা বলতাম।

পড়াশোনার কারণে ছোটবেলা থেকেই বাড়ির বাইরে থাকতাম। তার সম্পর্কে খোজ-খবর নিলাম। জানলাম, সে এসএসসি পরীক্ষার্থী। নাম হচ্ছে ফড়িং।

চব্বিশ রোজার দিন তার সঙ্গে দেখা করলাম। দুজনে মিলে ফালতু কথা বললাম প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে। এরই মধ্যে তাকে ঈদের নিমন্ত্রণ দিলাম। কিন্তু আমি কল্পনাও করিনি ফড়িং আমার নিমন্ত্রণ কবুল করে ঈদের দিন আমাদের বাসায় হাজির হয়ে যাবে!

ঈদের দিন নামাজ পড়ে বাসায় এসে আমার চোখ কোটর থেকে বের হয়ে যাবার মতো অবস্থা হলো। দেখি ফড়িং ও তার ছোট বোন আম্মার সঙ্গে বসে গল্প করছে।

আম্মা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, ব্যাপার কি?

ভান করলাম। আমি কিছু জানি না।

পরের ঘটনা হচ্ছে, আম্মাকে ভূগোল পড়িয়ে তাদেরকে নিয়ে বাইরে এসে তার ছোট বোনকে বাসায় পাঠিয়ে দিলাম। তারপর তাকে নিয়ে প্রায় সারা দিনই ঘুরে বেড়ালাম।

এ জন্য গত ঈদটাকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম ঈদ বলে মনে হয়।

ঠিকানা বিহীন
sagorzwestlife@yahoo.com

বার্ড পার্ক

- আলী হোসেন চৌধুরী

মনোরেল থেকে নামতেই চোখে পড়লো একটি সাইনবোর্ড। অন্য কয়েকটি ভাষার সঙ্গে বাংলায় লেখা, *পাখিদের কোনো খাবার দেবেন না। বিরক্ত করবেন না। আঘাত করবেন না। এদের প্রতি সদয় হোন।*

আকাবাকা সিড়ি বেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাড়ালাম। চারদিকে নানান বর্ণের পাখিদের কলকোলাহল। ডানপাশে ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে আসছে সুমিষ্ট পাখির ডাক।

এগিয়ে গেলাম। অবাক বিষয়, পাখি নয় দুই যুবতী। চায়নিজ। তাদেরকে সামনে রেখে পেছনের কংক্রিট বেঞ্চে বসলাম। কান পেতে থাকলাম তাদের উচ্চারিত দুই একটি শব্দ ধরতে। না পারিনি।

তারা টের পেল আমি পেছনে বসে আছি। ঘাড় বাকিয়ে বার বার আমাকে দেখছিল। অপূর্ব সুন্দরীদের কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দগুলো অবিকল পাখির ডাকের মতো।

পাখিদের নিজস্ব ভাষা আছে। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির ভাষাও ভিন্ন। পৃথিবী নামের এই ভূখণ্ডে মানুষের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি। পাখিদেরও তাই। পাখিদের ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য। আর আমার ভাষা পাখিদের কাছেও তাই। পাখিদের ভাষার কোনো বর্ণমালা নেই। আমার কাছে। পাখিদের সেক্স রয়েছে। এক জাতের পাখি অন্য প্রজাতির সঙ্গে সেক্স করে না, মানুষেরা করে।

১৯৯৫-এর রোজার ঈদ ছিল সেদিন। আমি পাখি বিশেষজ্ঞ নই, প্রেমিক। ছুটির দিনে অন্যরা যখন অন্যত্র ঘুরে বেড়ায় তখন যাই জুরং বার্ড পার্কে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে বার্ড পার্ক কি এমন প্রশ্ন মনে হতে পারে দেশে বার্ড পার্ক না থাকায়।

প্রকৃতি প্রেমিকদের জন্য জুরং বার্ড পার্ক একটি স্বর্গীয় স্থান মনে হবে। চারদিকে উচু নিচু পাহাড়, সামান্য দূরে সমুদ্র। হাজার রকমের ফলবান ও ফল বিহীন বৃক্ষে পরিপূর্ণ। মাথার উপর অনেক উচুতে রয়েছে স্টিল নেট। পাখিরা উড়ে বেড়ায় মুক্তমনে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে। প্রতিটি গাছের ডালে রয়েছে কৃত্রিমভাবে তৈরি পাখির খাবার স্থান ও নীড় যার পরিচর্যায় রয়েছে বাংলাদেশি তরুণেরা।

উত্তর মেরুর পেংগুইন থেকে মরু দেশের আবাবিলসহ এগারো হাজার প্রজাতির লাখ লাখ পাখি রয়েছে। পেংগুইন পাখিদের জন্য আবাসস্থল ভিন্নভাবে তৈরি। ওখানে রয়েছে মাইনাস তাপমাত্রা। বরফের ওপর গড়াগড়ি দেয়া জীবন্ত পেংগুইনদের দেখতে হয় কাচের গ্লাসের এ পাশ থেকে। এ এক বিচিত্র আকর্ষণ।

বার্ড পার্কের ভেতর এপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাবার জন্য রয়েছে এক পাতের ওপর দিয়ে চলমান মনোরেল। কখনো পাহাড়ের ঢালে কৃত্রিম ঝরনার পাশ দিয়ে অথবা গিরিখাদ পেরিয়ে মনোরেল আপনাকে নিয়ে যাবে স্বপ্নের জগতে। রেলে বসে বিচিত্র সব পাখি, ফুল, প্রকৃতি এবং অদূরে সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে ক্ষণিকের জন্য ভুলে যেতে হয়। পৃথিবীতে যুদ্ধ নেই, হিংসা নেই, বিভেদ নেই। মনে মনে গাইতে ইচ্ছা হবে, *এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মন যেতে নাহি চায়...*।

পাখিদের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় মানুষের আগমন এখানে। শুধু পাখি দেখা নয়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মানুষ দেখাটাও একটা বাড়তি আকর্ষণ।

চায়নিজদের আচরণ সম্পর্কে আমার জানা। এরা কাউকে ডিসটার্ব করে না। অন্যরা করুক তাও মেনে নেয় না। তবু অনেকটা সাহসে ভর করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলাম, আমি কি জানতে পারি, তোমরা কোন ভাষায় কথা বলছো?

আমার এ অবাঞ্ছিত প্রশ্নে তারা থমকে গেল। একজন অন্যজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর জবাব এলো, কেন?

না, এমনিতেই। তোমাদের ভাষার সাউন্ড অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

সত্যি?

হ্যা।

আমরা *ক্যানটনিজ* ভাষায় কথা বলেছি। এটা আমাদের মাতৃভাষা।

ক্যানটনিজ শব্দটা সোনার পর মনে পড়লো, এই ভাষা এখানে অঘোষিত, নিষিদ্ধ। কারণ এটা তাইওয়ানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। সিংগাপুরের চায়নিজদের জন্য রয়েছে প্রথমে *ম্যানডারিন* দ্বিতীয়ত, *হুক্কিয়ান।*

বললাম, তোমার ভাষাটা শুনতে অনেকটা পাখির ডাকের মতো।

দুজন উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। একজন বললো, তোমার ভাষা কি?

বললাম, বাংলা।

তোমার নিজস্ব ভাষায় কথা বলো তো।

এবার খাটি বাংলা বললাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আবারও হেসে উঠলো। বললো, আমার ভাষাটা পাখির স্বরের মতো শোনায়, তাই না?

হ্যা।

তোমার ভাষাটা মনে হয়েছে ষাড়ের গর্জন। তারা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লো।

ঈশ্বরের কি বিচিত্র সৃষ্টি! পৃথিবীর মানুষ জীবজন্তু পাখি, মাছ, মাছি ইত্যাদির জন্য দিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা।

মাথার উপর ডালে বসে এক জোড়া চড়ুই জাতীয় পাখি বিনা নোটিশে সেক্স করছে।

তারা দেখলো, আমিও।

আমি কিছুটা লজ্জা পেলাম, তারা পেল না। একজন অন্যজনকে পাখিদের প্রতি আঙুল উচিয়ে দেখাচ্ছে এবং হাসছে।

পাখি দুটি লজ্জা পেল সম্ভবত। কিচিরমিচির শব্দে প্রতিবাদ জানিয়ে উড়ে গেল অন্যত্র।

ছুটির দিনে এখানে পাখিদের লাইভ শো হয়। উন্মুক্ত আকাশের নিচে গ্যালারিতে বসতে পারে কয়েক হাজার মানুষ। নিচে স্টেজে বিভিন্ন পাখিদের নাচ, গান এবং মানুষের ভাষা যেমন ম্যানডারিন, জাপানিজ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ ভাষায় নির্ভুলভাবে মাইকের সামনে পাখিরা গান গায়, কথা বলে এবং নাচে। এরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত। এ এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

জুরং বার্ড পার্কে প্রায়ই যাই, বিশেষ করে ঈদের ছুটির দিনে। এসব পাখি ও আমার মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। অমিল শুধু একটা তারা পাখি আর আমি সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। এই পাখিদের ঈদ নেই। যেমন এই প্রবাসে আমারও ঈদ বলতে বিশেষ কোনো অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ নেই। এই পাখিরা একটা নির্দিষ্ট সীমারেখায় মুক্ত, আমিও। পাখিরা ইচ্ছা করলে এই সীমারেখার বাইরে যেতে পারবে না, আমিও। তারা বন্দী বিশাল খাচায়, আমিও। তাদের একটা কঠোর কঠিন নিয়মের ভেতর দিন যায়, রাত আসে। আমারও। তাই তো বার বার ছুটে আসি পাখিদের কাছে, এই নগ্ন প্রকৃতির কাছে।

পাখিরা উড়ে চলে একস্থান থেকে অন্যত্র। হাজার রকমের বিচিত্র পাখিদের মধ্যে ঝগড়া নেই, যুদ্ধ নেই, হিংসা নেই। একে অন্যের বাসস্থান দখল করে না। একে অন্যের খাদ্য খায় না। এ এক সুন্দর সহঅবস্থান।

অনেক বছর আগের কথা। আমার একমাত্র মেয়ের শখ হলো খাচায় পুরে পাখি পোষার। তার জমানো টাকা দিয়ে খাচা কিনলো এবং একটি দেশি পাখি সংগ্রহ করে তাতে ভরলো। সে পাখিটিকে নিয়মিত খাওয়া এবং পরিচর্যা করে।

যখন খাচার কাছে যাই, মনে হয়, পাখিটি তার ভাষায় একরাশ অভিযোগ জানাচ্ছে। ভাষাটা বুঝি না, অনুভূতিটা বুঝি। পাখিটির আত্মীয়েরা বাইরে গাছের ডালে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। খাচার কাছে আসতে চায়, পারে না।

বিষয়টি আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিল। মামণিকে ডেকে বললাম, তুমি, পাখিটা ছেড়ে দাও।

মনে হলো, এ কথা বলায় সমগ্র পৃথিবী ভেঙে পড়েছে তার মাথায়।

তাকে কাছে বসিয়ে বললাম, তোমাকে কেউ যদি এই ঘরে বন্দী করে রাখে, বাইরে যেতে না দেয়, কারো সঙ্গে দেখা করতে না পারো তাহলে তোমার কেমন মনে হবে?

সে বললো, আব্বু, ওটা তো পাখি।

তাতে কি। পাখিরও তো প্রাণ আছে, ভাষা আছে, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন সকলেই আছে ঠিক মানুষের মতো।

মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার মেয়েটি বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল ওই অল্প বয়সে। সে নিজ হাতে খাচা খুলে পাখিটা ছেড়ে দিল।

মুক্তির আনন্দে পাখিটি লেজ নাড়িয়ে কিচিরমিচির শব্দে উড়ে গেল আকাশে।

এখন মুক্ত পাখিগুলোকে আমার মেয়ে খাবার দেয়। কিন্তু খাচায় বন্দী করে রাখার কথা সে আর কোনোদিন ভাবেনি।

আমাদের দেশে শীতের মরসুমে উত্তর মেরুর প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ থেকে বাচার জন্য, অতিথি পরায়ণ বাংলাদেশে দল বেধে আসে নানান রঙয়ের পাখিরা। শৌখিন ও পেশাদারী শিকারিরা তাদেরকে হত্যা করে নিষ্ঠুর নির্মমভাবে। তারপর সুখাদ্যে পরিণত করে। বাচার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে এসে এরা মোটেও নিরাপত্তা পায় না গুটিকয়েক মানুষ নামধারী শিকারিদের জন্য।

বার্ড পার্কে এলে সবচেয়ে খুশি হয় ছোট ছেলেমেয়েরা। পাখিদের এতো কাছে পেয়ে, পাখির গায়ে হাত দিয়ে, পাখিকে নিয়ে ছবি তুলে আনন্দ পায়। ছুটির দিনে এরা দল বেধে আসে পাখি দেখতে।

দেশ থেকে যারা আমেরিকা, কানাডা বা ইওরোপ যাবার স্বপ্ন দেখেন অথচ নানান প্রতিকূলতা, নিয়ম-নীতির কঠোরতায় যেতে পারছেন না, তারা *দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর* মতো সিংগাপুরে আসতে পারেন। চিরবসন্তের এক ঋতুর এই দেশে মানুষের তৈরি প্রকৃতিকে দেখে আপনি অভিভূত হবেন। এবং দেখতে পাবেন প্রকৃতিকে মানুষ তার মেধা, শ্রম ও সততা দিয়ে কতো নিখুতভাবে গড়ে তুলেছে। এখানে এলে জুরংয়ে অবস্থিত বার্ড পার্ক দেখতে ভুল করবেন না।

আমার মনে একটা কৌতূহল ছিল। মানুষের মাঝে লুচ্চা, বদমায়েশ, ধর্ষণকারী, চোর আরো কতো কি রয়েছে। পাখিদের মধ্যে কি এসব রয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুজতে গিয়ে অনেকগুলো ছুটির দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়েছি পাখিদের সঙ্গে। বদমায়েশ, মাস্তান টাইপের পাখি পেয়েছি। কিন্তু লুচ্চা বা ধর্ষণকারী পাইনি একটিও। সেক্স বিষয়ে কিছু পাখি রয়েছে যারা ইওরোপ বা আমেরিকার কালচার ফলো করে। অর্থাৎ একাধিক ফ্রেন্ড থাকে। কিছু রয়েছে অত্যন্ত রক্ষণশীল। এরা কেবল একজন ফ্রেন্ডের সঙ্গে মিলিত হয়, ঘুরে বেড়ায় এবং একই কুঠরিতে থাকে।

একই প্রজাতির শ শ পাখি কোথাও কোনো গাছে একত্রে বসে থাকতে দেখলে মনে করতে হবে তাদের স্বগোত্রীয় কারো মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুটা যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে পাখিরা চুপচাপ গাছের ডালে বসে থাকবে। যদি কোনো মানুষের মাধ্যমে হয় তাহলে চলে আক্রমণ। মানুষ দেখলে এরা ক্ষেপে যায়, তেড়ে আসে, আক্রমণ করে সাধ্য মতো। তারপর এক সময় স্বাভাবিক হয়ে যায়।

মহান ঈশ্বর পৃথিবীতে কতো কিছুই না দিয়েছে মানুষের প্রয়োজনে। পৃথিবী নামের এই বালুময়, রুক্ষ, আদ্র গ্রহটি মানুষ শত কোটি বছর ধরে সাজিয়েছে। তারপর তারা চলে গিয়েছে। আমি ও আমরা একদিন চলে যাবো।

জন্মের আগে কোথায় কোনো গ্রহে ছিলাম মনে নেই। মনে থাকতে পারে না। মৃত্যুর পর আবার কোন গ্রহে ট্রান্সফার হবো জানি না। ওই গ্রহটা পৃথিবী থেকে কতোদূর? মহান ঈশ্বর সেখানে কি মানুষ হিসেবেই আমাকে পাঠাবে, নাকি অন্য কিছু তা জানি না। মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে সময়, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর যেভাবে কাটালাম তার চেয়ে অন্য কোনো গ্রহে পাখি হলে মন্দ হতো না।

এয়ারপোর্ট রোড, সিংগাপুর থেকে

দেশে ফেরা

- এস. এম আবদুল খালেক

ঈদের কয়েকদিন পরের ঘটনা। জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে বিশেষ ফ্লাইটে হজ পালন শেষে দেশে ফিরবেন আব্বা। রাত এগারোটায় জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্লেন ল্যান্ড করার কথা। তাকে রিসিভ করার জন্য আমরা সিরাজগঞ্জ থেকে রওনা দিয়ে ফার্মগেটে ছোট ভগ্নিপতির বাসায় গিয়ে উঠলাম।

রাতে এয়ারপোর্টে যাবো আব্বাকে আনার জন্য।

ছোট বোন এবং আমার মেয়ে বায়না ধরলো তারাও যাবে আমার সঙ্গে।

কিন্তু এতো রাতে তাদের নিয়ে এতো রাস্তা আসা নিরাপদ হবে না ভেবে বারণ করলাম।

তারা কিছুতেই রাজি নয়।

শেষে সন্ধ্যার পর এয়ারপোর্ট থেকে তাদের ঘুরিয়ে এনে রাতে বাসায় রেখে খাওয়া সেরে সাড়ে দশটার দিকে আবার রওনা দিলাম।

এয়ারপোর্টে পৌছে অনুসন্ধান কাউন্টারে খোজ নিয়ে জানতে পারলাম জেদ্দা ফ্লাইট তিন ঘণ্টা লেট। তার মানে রাত দুইটার আগে প্লেন আসবে না।

অগত্যা আর কি করা যায়! বাইরে খোলা বাতাসে অনেকক্ষণ হাটাহাটি করছি। তারপর এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকে বসার জন্য টিকেট কাটতে যাবো। এমন সময় দেখতে পেলাম কিছুক্ষণ আগেই মালয়শিয়া থেকে একটা ফ্লাইট ল্যান্ড করেছে তার যাত্রীরা ট্রলিতে করে ল্যাগেজসহ বেরিয়ে আসছেন। এবং ট্যাকসিক্যাব ভাড়া করে যার যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছেন।

আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় বেশ ভিড় লক্ষ্য করলাম এবং দেখতে পেলাম একজন যাত্রী এক বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে কাদছেন।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, তার ছোট ভাইটি যেটা কলেজে পড়তো এবং দুই বছর আগেও যে এয়ারপোর্টে এসে বড় ভাইকে বিদায় দিয়েছিল সে ঈদের কয়েকদিন আগে মারা গেছে। কিন্তু যেহেতু বড় ভাই বিদেশ থেকে এসে লাশ দেখতে পারবেন না ও দাফন-কাফন করতে পারবেন না তাই তাকে আর মৃত্যুর খবরটা জানানো হয়নি। আজ এয়ারপোর্টের বাইরে এসে তিনি যখন জানতে পারলেন তার ছোট ভাই এ পৃথিবীতে নেই, তখন যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ঘটনাটি শুনে উপস্থিত অনেকেই দেখলাম রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন।

আমিও চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না।

পরে সবাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিলেন।

আমরা ভেতরে ঢোকার টিকেট কেটে এয়ারপোর্টের ভেতরে গিয়ে বসলাম। রাত আড়াইটায় কমপিউটার বোর্ডে দেখলাম জেদ্দা ফ্লাইট ল্যান্ড করেছে।

কিছুক্ষণ পরেই আব্বা বেরিয়ে এলেন।

ল্যাগেজসহ আমরা বাইরে এসে পুনরায় ট্যাকসিক্যাব ভাড়া করে ফার্মগেটের পথে রওনা দিলাম।

বনানী রেল ক্রসিং আসার আগেই পুলিশ আমাদের গাড়ির গতি থামিয়ে দিল।

পুলিশ দেখে আমাদের রাস্তার নিরাপত্তার যে ভয়টা ছিল সেটা কেটে গেল।

তখন রাত প্রায় পৌনে চারটা বাজে। আমরা পুলিশকে বললাম, আমাদের গাড়িতে হাজি আছেন। এয়ারপোর্ট থেকে আসছি।

তখন আর বেশি কিছু বললো না। শুধু মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে আমার কোমরের বেল্ট পরীক্ষা করে বললো, আপনারা যেতে পারেন। কোনো অসুবিধা নেই।

তারপর সারা পথ গাড়িতে বসে ওই ভদ্রলোকের কথা বার বার মনে পড়লো। হয়তো এক ঈদে আব্বা সউদিতে ছিলেন, তার জন্য তাকে আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু ওই ভদ্রলোক সারা জীবনে আর কোনোদিনও দেশে ফিরে তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ঈদ করতে পারবেন না।

জামতৈল কলেজ পাড়া, সিরাজগঞ্জ থেকে

রুহুল আমিন

- সাদিক

রুহুল আমিন। এটা আমার পুরো নাম। একই সঙ্গে আমাদের পাড়ার একটা বেওয়ারিশ কুকুরের নাম। কুকুরটাকে প্রতিদিন ফজরের নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় যখন রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখি তখন মনের কোণে অনেক স্মৃতি ভেসে ওঠে। কুকুরটার মালিক যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই আমি। বাসায় কুকুর পালাটা ধর্মীয় দিক থেকে খারাপ বলেই তাকে বাসায় না রেখে পালার চেষ্টা করি।

কুকুরটাও আমাকে দেখলে অনেক দূর থেকে হলেও কাছে আসার চেষ্টা করে। বাকা লেজটা নাড়িয়ে আমার প্রতি তার ভক্তি প্রকাশ করে।

কুকুরটার প্রকৃত মালিক ছিলেন জালাল নামের এক ভদ্রলোক। এক বছর হলো তিনি মারা যাওয়ার পর থেকে কুকুরটা বেওয়ারিশ। ভদ্রলোক আমার প্রতি তার ক্ষোভের কারণেই আমার নামে কুকুরটা পালা শুরু করেছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি কিছুটা মানসিক রোগী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই সবার ধারণা, কুকুরের এই নামকরণটা ছিল তার খামখেয়ালি।

জালাল ছিলেন এলাকার এক বড়লোকের বাড়ির দারোয়ান। বাড়িওয়ালার ছোট মেয়ে তিথি ছিল আমার ক্লাসমেট। আমরা এক সঙ্গে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে পড়তাম। তার রূপের কাছে পূর্ণিমার তিথি বাস্তবিকই আমার তুচ্ছ মনে হতো। তার হাসি, কথা বলা সবই ছিল এক কথায় অতুলনীয়।

সৌন্দর্য অবশ্য কিছুটা আপেক্ষিক। অনেক সময়ই দেখা যায় একজনের চোখে যিনি পরমা সুন্দরী, আরেকজনের চোখে তিনি অতি সাধারণ। তবে আমার দৃষ্টির সঙ্গে লোকের দৃষ্টির যে অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ মিল ছিল সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। অসংখ্য ছেলের ভিড় ছিল তাকে ঘিরে। সেই ভিড় থেকে সব সময়ই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতাম।

কথায় বলে, *যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়*। তার সঙ্গে কিভাবে যে ঘনিষ্ঠ হলাম তা সত্যিই অবাক করা ব্যাপার!

মফস্বলের স্কুলে লেখাপড়া করে ঢাকার সরকারি বিজ্ঞান কলেজে পড়াশোনা করি। বাবা–মা গরিব। এখানে থাকি ছোট চাচার বাসায়। নিঃসন্তান চাচার বাসায় থেকেই পড়াশোনা করতাম। চাচা আমার পিতৃস্নেহে রাখেন। তিনি ইউনিভার্সিটির হলে আমাকে উঠতে দেননি কখনো। আমার মতো এক শাদামাটা ছেলে কিভাবে যে সেই ভিড়ের বাইরে থেকে ভিড় ঠেলে তিথির এতোটাই ঘনিষ্ঠ হলো সেটা আমার নিজের কাছেও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

তিথি মাঝে মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের বাস *চৈতালি*–তে যাওয়া–আসা করতো। যখন আমরা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, একদিন কি জন্য যেন বাসে সে খুব অসুস্থ হয়ে গেল। সেদিন তাকে বাসায় পৌছে দিলাম। স্বাভাবিকভাবেই সে বয়সের ছেলের যা হয়, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। বেশ খানিকটা দুর্বল হয়ে গেলাম।

ছাত্র হিসেবে ক্লাসে আমার কিছুটা সুখ্যাতি ছিল। নিজের পছন্দের সাবজেক্ট ফিজিক্সে ভর্তি হয়েছিলাম। বলতে গেলে ক্লাসের প্রথম সারির ছাত্র ছিলাম।

তিথি মাঝে মধ্যে পরীক্ষার আগে চাচার বাসায় ফোন করে পরীক্ষার খোজ–খবর নিতো।

আগে এড়ানোর চেষ্টা করলেও সেই ঘটনার পর থেকে তাকে আর এড়াতে পারিনি।

এরপর থেকে দুজনের কথা, বিভিন্ন উপলক্ষে নিয়মিত উপহার আদান–প্রদান চলতে থাকে। তার যাতায়াতের সুবিধার জন্য সে প্রাইভেট কার ব্যবহার করতো। তাতে সে প্রায়ই আমাকে লিফট দিতো। তাদের দারোয়ান জালালের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল ভাইয়ের মতো। তাই তার পক্ষে ব্যাপারটা আচ করা কঠিন ছিল না।

তিথির বাবা খুবই বুদ্ধিমান লোক। সব বাবা–মাই তো ছেলেমেয়ের মন বোঝেন। তিনিও বিষয়টা আচ করতে পেরে জালালকেই পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেন। জালালভাইকে আমিও নানান প্রলোভন দেখিয়ে কোনো রকমে ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রাখি।

তিথির বাবা ঘটনাটি স্পষ্ট বুঝতে পারেন যখন তিনি দেখেন তার মেয়ের বিয়ের বিষয়ে চরম অনীহা।

সব সুপাত্র তিথির চোখে রীতিমতো ভিলেইন।

তিথির বাবা তখন তাদের ড্রাইভারকে এই কাজে লাগান।

ড্রাইভার সব জানিয়ে দেয় এবং জালালের সব বিশ্বস্ততাও একেবারে গুড়িয়ে দেয়।

জালালকে তার বাবা পদচ্যুত করেন। সেই সঙ্গে বেশ কয়েক মাসের বেতনও কেটে রেখে দেন।

বেচারা গরিব জালাল আবার সেই সময় বাধিয়ে বসেন ভয়ংকর অসুখ, লিভার সিরোসিস। দারিদ্রের কষাঘাতে ও অসুখে তিনি মানসিক রোগী হয়ে যান।

আমি তখন স্বীকৃত বেকার। তার জন্য কিছুই করতে পারিনি।

সেই রাগেই সে আমার নামে কুকুর পালে।

জালালের কথা মনে হলে নিজেকে খুব নিচ, হীন মনে হয়।

তিথিকে জোর করেই বিয়ে দেন তার বাবা। তাছাড়া পাস করার পরে বেকার হয়ে বসে থাকা এক ছেলের জন্য তিথিই বা কতোদিন তার বাবা–মাকে থামিয়ে রাখতে পারতো? আমেরিকা প্রবাসী এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের ছয় সাত মাস পরই সে চলে যায় কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সুদূর আমেরিকায়।

তার বিয়ের দুই মাস আগে জালাল মারা যান।

তারপর থেকে রুহুল আমিনের দেখাশোনা আমিই করি। লোকেরা এটা আমার বদান্যতা মনে করে। তিথি দেশে থাকতেই একটা বেসরকারি কলেজে চাকরি পাই যাতে নিজের পেট বেশ ভালো মতোই চালানো যায়।

চাকরিটা পাওয়ার পর একদিন তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি। সেদিনের দূরালাপই ছিল তার সঙ্গে আমার শেষ আলাপ। সেই দিন তার প্রিয়ংবদার মতো আর্শীবাদ আজও আমার কানে ভাসে।

তার জন্য দুঃখ করতে সে আমাকে নিষেধ করে। এরপর বিদেশে যাওয়ার আগে সে একদিন আমাকে ফোন করেছিল।

তখন বাসার বাইরে ছিলাম। বাসায় ফিরে যখন তার কথা শুনলাম ফোন করতে আর ইচ্ছা হলো না। যাকে ভুলতে হবে তার কথা বার বার মনের মধ্যে নিয়ে কি লাভ!

এখন রাতে যখন মাঝে মধ্যে রুহুল আমিনের ডাক শুনি তখনই তার কথা মনে হয়। ভোরে নামাজের পর, সকালে বাইরে যাওয়ার সময় কুকুরটা যখন আমার সঙ্গী হয় তখনই জালাল আর তিথির কথা মনের কোণে ভেসে ওঠে।

তিথির অনেক উপহার আমার কাছে থাকলেও সবই তালাবদ্ধ করে আমার ট্রাংকের মধ্যে রেখে দিয়েছি। সেই ট্রাংক খুলি না ছয় সাত মাস। খোলার ইচ্ছাও নেই। কিন্তু যখনই রাতে কুকুরটার ডাক শুনি, বেডরুমের জানালা দিয়ে কুকুরটাকে দেখি, সব প্রতিরোধ হারিয়ে ফেলি।

প্রেমের গান শুনি না ধর্মীয় কারণেই হোক বা আত্মিক কারণে হোক। এটা মানুষকে আবেগ প্রবণ করে। কিন্তু কুকুরটার ডাক শুনলেই মনে হয় You can hear the whistle blow hundred miles. আরো মনে হয়, এই তিথির অমাবস্যা কখনোই শেষ হবার নয়!

কল্যাণপুর, ঢাকা থেকে

No No No

- সাহাবুদ্দিন

আজ আমার জীবন নিস্তব্ধ। এর কারণ যে তার নাম পান্না। তাকে না দেখলে আমার কিছুই দেখা হবে না। তার কথা না ভাবলে আমার কিছুই ভাবা হবে না। তাকে না পেলে আমার কিছুই পাওয়া হবে না।

প্রতিটি মুহূর্তে শুধু তাকে নিয়েই ভাবতে থাকি। সে যে আমার হৃদয়ে কতোটা স্থান দখল করে নিয়েছে তা কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

তাকে এক নজর দেখবো বলে তার কাছে বই চাইতে যেতাম। প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বইটা রেখেই দিতাম যেন সে আমার কাছে চাইতে আসে। তাহলেই না এক পলক দেখবো।

তাকে যেদিন দেখতে না পেতাম সেদিন বাইনোকুলার নিয়ে ছাদে উঠতাম। জোনাকি রাতে তাকে দেখতাম, সে পড়ছে। মনটা ভালো হতো। কিন্তু কিছুতেই তাকে আমার মনের কথাগুলো জানাতে পারছিলাম না।

বন্ধুদের কথায় একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম, আজ বলবোই। তাই এক সময়ে হাজির হলাম তার সামনাসামনি। দাড়িয়ে, চোখে চোখ রেখে বললাম, পান্না, আমি তোমাকে পছন্দ করি।

সে যেন শুনতেই পেল না।

আবার বললাম, পান্না, তোমাকে আমি পছন্দ করি।

সে এবার কানে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে বলতে থাকলো, No, no no। না, না, না।

তাকে বললাম, আবার বলো।

সে এবারও একই স্টাইলে বলতে থাকলো না, না, না।

সেদিন শুধু বলেছিলাম, পান্না, তুমি আমাকে উপহার দিলে কান্না।

চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

হিমাচলের বিভিন্ন প্রান্তে

- রিয়াজউদ্দিন আহমদ

আমরা দুই বন্ধু প্রতি বছরই ইনডিয়ার কোনো এক প্রান্তে ভ্রমণের জন্য বের হই।

এবার আমরা ইনডিয়ার হিমালয় পবর্তের কিছু অংশ দেখার জন্য হিমাচল প্রদেশকে বেছে নিলাম। এ বছরের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে *জম্মু–তাওয়াই এক্সপ্রেস*–এর টিকেট কাটলাম। দূরত্ব এক হাজার আটশ সাতানব্বই কিলোমিটার। দুই দিন দুই রাতের সফর।

সকাল দশটা নাগাদ আমরা পাঠানকোট স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। হিমাচলের চাম্বা শহরের উদ্দেশ্য বারোটার বাস ধরলাম। দূরত্ব একশ ষাট কিলোমিটার।

শিবালিক পর্বতমালা দেখতে দেখতে বাস আমাদেরকে চাম্বা শহরের কেন্দ্রবিন্দু বিশাল চৌগান মাঠের একধারে বিকাল চারটায় নামিয়ে দেয়। এই মাঠকে ঘিরেই বাজার, বাস স্ট্যান্ড, মন্দির সব কিছু গড়ে উঠেছে। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন পাহাড়ি শহর। চাম্বার এক রাজার নামে ভুরি সিং মিউজিয়ামে কিছু শুচি কাজের প্রাচীন রুমাল ইত্যাদি দেখলাম। শুনলাম চামুন্ডা মন্দির থেকে শহরের দৃশ্য অপূর্ব লাগে। কিন্তু মন্দির অনেক উচুতে পাহাড়ের ওপর।

খাড়া পাহাড়। কিছু দূর উঠেই হাফিয়ে পড়লাম। আর বয়স্কদের পক্ষে পায়ে হেটে যাওয়াও সম্ভব নয়। তাই ফিরে এলাম।

পরদিন ইনডিয়ার সুইটজারল্যান্ড নামে খ্যাত ভারমোর যাত্রা করলাম। চাম্বা থেকে ভারমোর পয়ষট্টি কিলোমিটার। সকাল ছয়টায় বাস ছাড়লো। শহর ছাড়িয়েই শুরু হলো চড়াই আর উৎরাই।

ইরাবতী নদীর তীর ঘেষে বেশ উচুতে এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে বাস ধীর গতিতে চলছে। চলার পথে পাহাড়ের সব ভয়ংকর হ্যাং, মনে হয় এই বুঝি ভেঙে গাড়ির ওপর পড়লো।

ইরাবতী বৃজের কাছে খাড়া মুখে বাস কিছুক্ষণের জন্য থামলো। এখানে প্রচণ্ড বেগে বুড্ডাল ও ইরাবতী নদীর মিলন হয়। ভারমোর এক ছোট্ট লোকালয়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। গাছে গাছে আপেল ধরে আছে, হাত বাড়ালেই ধরা যায়। আগে এখানে চাম্বা থেকে হেটে আসতে হতো।

দুই দিন পর ধর্মশালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। দুপুরের পর বাস ধর্মশালায় পৌছলো।

বাস স্টেশন থেকে অনেকটা সিড়ি ভেঙে শহরে উঠে এলাম। একটি হোটেলে আশ্রয় নিলাম। দুপুরের ভোজন সাঙ্গ করে জনবহুল বাজার, দোকানপাট ঘুরে এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে আবার ধর্মশালা বা ম্যাকলিয়ডগঞ্জে গেলাম। অনেকটা উপরে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। নিচে লোয়ার ধর্মশালা এবং আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অপরূপ লাগে।

তিব্বতের দালাই লামা বর্তমানে এখানেই বাস করেন। পথের দুই পাশে সব তিব্বতি হস্তশিল্পের দোকান। পথে–ঘাটে তিব্বতি লোকজন, মনে হয় যেন তিব্বতের রাজধানী লাসায় এসে গেলাম।

এর পরদিন সকালে ধর্মশালা থেকে কুলুর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সমস্ত পথের দুই পাশে বড় বড় পাহাড়। চা বাগানের পালামপুর, যোগীন্দরনগর হয়ে মান্ডি শহরে এলাম। অল্প পরেই পান্ডো ড্যামের জলাধারটি নজরে পড়লো। অপূর্ব দৃশ্য।

মান্ডির পর থেকেই কুলু ভ্যালি শুরু হলো। এখান থেকে বিপাশা নদী হলো আমাদের সঙ্গী। সন্ধ্যার পর আমরা কুলু বাস স্ট্যান্ডে পৌছালাম। কুলুর চারপাশেই পাহাড়। রাতের অন্ধকারে ঘরবাড়ির আলোগুলো দেখে মনে হয় পাহাড়ে পাহাড়ে যেন প্রদীপ জ্বলছে। অর্থাৎ সেখানেও লোকজনের বসবাস রয়েছে। যদিও

কুলুর নদীতে এখন হাটু পানিও নেই তবু এর উচ্ছলতা কম নয়। কুলুর অতি কাছেই রয়েছে বিখ্যাত সব শালের কারখানা। আমরা দুজনেই দুটি করে সুন্দর লেডিস শাল কিনলাম।

কুলু থেকে পয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে মনিকরণ। পর্যটকদের জন্য এক আকর্ষণীয় স্থান। পাইন, ওক, দেবদারু গাছে ভর্তি সারাটি পথ সুন্দর। অপরূপ এর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। কিন্তু পথটি বেশ দুর্গম। পথের বাম দিকে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পার্বতী নদী। নদীতে পানি কম হলেও ভয়ানক খরস্রোতা। সমস্ত নদীটিই উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ।

এই পার্বতী উপত্যকায় *কাসেল* ও *জারি* নামে দুটি সুন্দর গ্রাম। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব সুন্দর। বিদেশি পর্যটকরা এখানে এসে কিছু দিন থেকে যায়। দুই পাশের পাহাড় এখানে আরো কাছাকাছি চলে এসেছে। উপত্যকা এখানে খুবই সংকীর্ণ। মনিকরণে হিন্দু ও শিখদের দুটি বড় তীর্থ স্থান রয়েছে। বাস স্টেশন থেকে কংক্রিটের বৃজ পার হলেই সরু গলি। পথে বাজার, দোকানপাট লোকজন দেখা যায়। এখানকার উষ্ণ কুণ্ডটি বিখ্যাত।

কুলু উপত্যকার সর্ব উত্তরে মানালি অবস্থিত। শহরের অতি কাছে দেওদার পাইনের পার্কের পাশেই বিপাশা নদী। মানালির *ম্যালের* হোটেলের বারান্দা থেকেই দূরে বেশ ঢালু সবুজে ছাওয়া বিশাল পাহাড়। মানালি তেমন নিরিবিলি নয়। দোকানপাট, বড় মার্কেট এবং পর্যটকে গম গম করছে। অন্য পর্যটকদের মতো আমরাও মার্কেট ঘুরে কিছু জিনিসপত্র কিনলাম।

পরের দিন মানালি থেকে তিপান্ন কিলোমিটার দূরে বারো হাজার ফিট উচ্চতায় রোহটাং পাস দেখতে গেলাম। বাসে আড়াই তিন ঘণ্টায় পৌছানো যায়। রোহটাং পাশের রাস্তার উচ্চতা আর চড়াই যেমন মুগ্ধ করে তেমনি মনে শংকাও জাগায়। পথের একদিকে পাহাড়ের সুউচ্চ প্রাচীর, অন্যদিকে অতল গিরিখাদ। বহু নিচের বিপাশা নদীকে দেখায় চুলের ফিতার মতো চিকন।

দিগন্ত বিস্তৃত পর্বতরাজির মধ্যে কোনো কোনো পর্বতশৃঙ্গ মহিমামণ্ডিত করে তুলেছে সমগ্র দৃশ্যকে। আবার কোনো জায়গার সবুজ কার্পেটে মোড়া এক ফালি জমি বা কোনো ঝরনাধারা যেমন রহলা প্রপাত, কখনো বা অনেক নিচে উপত্যকার ওপর মেঘের ক্ষুদ্র খণ্ডগুলোকে মনে হয় একরাশ ধোয়া বা কুয়াশা। এসব নয়ন মুগ্ধকর দৃশ্য মনকে আনন্দে আপ্লুত করে দেয়। মনে এনে দেয় এক স্বর্গীয় প্রশান্তি। সমস্ত পাহাড়ময় যেন মুনি-ঋষিদের মতো শান্ত-স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ এক গম্ভীর ভাব বিরাজমান। রোহটাং পাসে বছরের প্রায় সব সময়ই বরফ থাকে। গরমে পাহাড়ের সব বরফ গলে যাওয়ার পরেও তখনো কিছুটা অবশিষ্ট ছিল।

সবশেষে গেলাম হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায়। মানালি থেকে সিমলার দূরত্ব প্রায় দুইশ আশি কিলোমিটার। বারো ঘণ্টার পথ। ১৯১৮ সালে বৃটিশদের গড়ে তোলা শৈলাবাস সিমলার আকর্ষণ আজও অটুট। বেশ উচ্চতায় এর প্রধান রাজপথ প্রশস্ত মল-এ আজও আভিজাত্যের ছাপ বজায় রয়েছে।

আমরা সিমলার আশপাশে ফাগু, কুফরি, ইন্দিরা পার্ক ইত্যাদি বিডটি স্পটগুলো মারুতি গাড়ি ভাড়া করে বেড়িয়ে এলাম। পরের দিন ৭ জুলাই মরসুমের প্রথম বৃষ্টির মধ্যে *কালকা* স্টেশন থেকে কলকাতার ট্রেন ধরার জন্য সিমলা ছাড়লাম।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

ঈদের টিপস

- হিজল

ঈদ সমাগত। অনেকেই হয়তো গ্রামের বাড়ি যাবার মহা পরিকল্পনায় ব্যস্ত। তাই ঢাকাত্যাগী সেই সব শুভাকাঙ্ক্ষীদের, বন্ধুদের উদ্দেশে আমার কয়েকটি টিপস।

এক. নিজ কিংবা ভাড়া যে বাড়িতেই থাকুন না কেন দয়া করে সকল বৈদ্যুতিক বাতির সুইচ, গ্যাসের চুলা এবং দরজা-জানালাসহ সব কিছু ঠিক মতো বন্ধ করুন।

দুই. যাবার আগে আপনার নিকটতম প্রতিবেশীকে একটিবার ভালো করে বলে যান যেন আপনার বাড়ির দিকটা তারা একটু খেয়াল রাখেন।

তিন. লঞ্চ কিংবা গাড়ি যে মাধ্যমেই যান না কেন, সঙ্গে স্বল্প পরিধেয় বস্ত্রসহ কম মালামাল নেবেন। কেননা কয়েকদিন পরেই তো আপনি ঢাকায় ফিরছেন।

চার. রাস্তাঘাট এবং যে কোনো পরিবহনে কারো দেয়া কিছু খাবেন না।

পাচ. যাত্রাপথে কখনো ঘুমাবেন না। উত্তম পন্থা হিসেবে ওয়াকম্যানে গান শুনুন, বাইরের চলমান প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করুন এবং সঙ্গে অন্যান্য পত্রিকার পাশাপাশি প্রিয় যাযাদির একটি বিশেষ *ঈদ* সংখ্যা রাখুন।

ছয়. আপনার স্ত্রী কিংবা কন্যা যেই হোক না কেন তাকে গহনা পরাবেন না। এতে বিভিন্ন স্টেশনে অসংখ্য লুচ্চা টাইপের মানুষের কুদৃষ্টি ও বহু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবেন।

সাত. ঈদ মানে সবার জন্য খুশি। প্রিয় বন্ধুরা, ঈদ বাজেটের মধ্যে আপনার যদি ন্যূনতম সামর্থ হয় তাহলে আপনার পাশের বাড়ির ওই গরিব ছেলে কিংবা মেয়েটির জন্য একটি লাল টুকটুকে সুন্দর জামা কিনবেন এবং ঈদের দিনে তাকে পেটপুরে খাইয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে একটু স্নেহমাখা ভালোবাসা দেবেন।

দক্ষিণ শ্যামপুর, সাভার, ঢাকা থেকে
hizal111@yahoo.com

লৌহ মানবী ও তার স্বামী

- এফ.এইচ পল্লব

ঢাকার কোচ থেকে রাজশাহী বাস টার্মিনালে নেমে রিকশা ধরে হ্যাচকাতে হ্যাচকাতে যখন আপার বাসায় পৌছালাম তখন ঘড়িতে বিকেল চারটা আর আমার বারোটা বেজে গেছে।

গেট পেরিয়ে ভেতরে আসতেই আপাদের বাইরের ঘরে গোলমালের শব্দ শুনলাম। পাড়ার চাদাবাজেরা হয়তো চাদা চাইতে এসে হই হল্লা করছে। ভুলটা ভাঙলো ড্রয়িংরুমের খোলা দরজায় দাড়াতেই। শা করে একটা চিনে মাটির অ্যাশট্রে উড়ে এসে আমার বুকে আঘাত করে মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল। বুক চেপে ধরে সোফায় বসে পড়লাম। এমন অভ্যর্থনা আশা করিনি। হতবাক হয়ে ঘরের চারপাশে তাকালাম।

আপা–দুলাভাই দুজন দুদিকে দাড়িয়ে তাদের সেই বিখ্যাত ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছেন...।

তাই বলে তুমি একমাত্র ছেলের আবদার রাখবে না?

আবদার রাখতে গিয়ে ছেলেকে আমি মাস্তান বানাতে পারবো না।

ঘরের এক কোণায় দাড়িয়ে আমার মতো ফ্যালফ্যালে চোখে বাবা–মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে আমার আদরের একমাত্র ভাগ্নে পিংকু। তার জন্য আনা চুইংগামের প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করতেই ছুটে এসে ছো মেরে কেড়ে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লো পিংকু আমাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে।

ঝগড়া চলছেই। আমার দিকে কোনো পক্ষেরই লক্ষ্য নেই।

এ সময় ঘরে ঢুকলো রিংকি আমার ভাগ্নি, কাধে স্কুল ব্যাগ। পিএন স্কুলের ক্লাস সিক্স–এর ছাত্রী। খানিকক্ষণ থমকে দাড়িয়ে থেকে আমার হাত ধরে তার ঘরে আনলো।

জামা–কাপড় ছেড়ে হাত–মুখ ধুয়ে বললো, নাও মামা, কেমন আছে নানু–নানা।

ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম রিংকির আন্তরিক অভ্যর্থনায়। দক্ষ গৃহিণীর মতো আমার অবস্থাটা রিংকি বুঝে ফেলেছে।

আরে বাবা, ছাড় তো আব্বা আম্মার কথা। তারা এ রকম ঝগড়া প্রতি মাসেই করে। তুমি ফ্রেশ হয়ে এসো। দুজনে ভাত খাবো। যা ক্ষিধে পেয়েছে!

ভাত খেতে খেতে ঝগড়ার কারণটা রিংকি বর্ণনা করলো। পাশের বাসার এমরানের খেলনা পিস্তল দেখে পিংকু কয়দিন থেকে পিস্তল কিনে দেয়ার বায়না ধরেছে। আপা পক্ষে, দুলাভাই বিপক্ষে। এই নিয়ে কয়দিন হলো ম্যারাথন ঝগড়া চলছে।

দুপক্ষই অনড়-অটল।

দুলাভাই-এর সাফ কথা, পিস্তল কিনে দিয়ে ছেলেকে মাস্তান তৈরি করবেন না।

আপার বক্তব্য, যেসব শীর্ষ মাস্তানদের লিস্ট বেরিয়েছে এদের কারো মা বাবাই ছোটবেলায় এদের খেলনা পিস্তল কিনে দেয়নি। এরা মাস্তান হয়েছে অন্য পারিপার্শ্বিক কারণে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আপা-দুলাভাইয়ের ঝগড়ায় নিমগ্ন হয়ে গেলাম।

এই আমার একমাত্র আপা। আমাদের দুই ভাইবোনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান দশ বছর। আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন আপা। ডান দিকেরটার তুলনায় আমার বাম কানটা বেশ বেখাপ্পা রকম বড় আর খাড়া ধরনের। এটা যে আপার স্নেহের কল্যাণে পরিচিত সবাই তা জানে। এই সেদিনও এসএসসি পরীক্ষা সমাপ্তকারী আমাকে রাত নয়টা বাজার পর ক্লাবের আড্ডা থেকে সবার সামনে কান ধরে হিড়হিড় কর টেনে বাসায় এনেছিলেন আপা। পাড়ার বখাটেরা এখনো আপাকে দেখলে বলে ওঠে, মন্টুর বড়ভাই। অবশ্য অনুচ্চ ফিশ ফিশ কণ্ঠে।

আপার কাছে এসব মাস্তানি-ফাস্তানি কিছুই না। তার পাচ ফিট সাত ইঞ্চি অ্যাথলিট সদৃশ্য শরীরে অসুরের মতো শক্তির সঙ্গে রয়েছে দুর্দমনীয় সাহস আবার নারী সুলভ কোমল-কমনীয়তাও। তাই তার পেছনে লাগতে এসে মার না খেয়ে ফিরে গেছে এমন মাস্তান আমাদের অঞ্চলে ছিলই না।

শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হবে। ফুটবল খেলা নিয়ে পাশের পাড়ার মিলনী সংঘের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের গণ্ডগোল বেধে গেল। তারা আমাদের ক্লাবে আচমকা আক্রমণ করে ভাংচুর করে ক্লাবের সেক্রেটারি পিলুকাকাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। ভয়াবহ থমথমে অবস্থা। খবর দেয়া সত্ত্বেও পুলিশ অনুপস্থিত। এমন সময় অনেক দিন পর স্বমূর্তি ধারণ করলেন আপা। গণ্ডগোলের কথা শুনে আমাকে খুজতে ক্লাবের চত্বরে এসে সব শুনে উপস্থিত পরাজিত ক্লাব সমর্থকদের বললেন তোদের সেক্রেটারিকে উঠিয়ে নিয়ে গেল আর তোরা এখানে দাড়িয়ে আঙুল চুষছিস হুহ! বলে ক্লাবের কার হাত থেকে যে একটা হকি স্টিক ছিনিয়ে নিয়ে মিলনী সংঘের দিকে ছুটে চললেন।

পরনে সালোয়ার-কামিজ। ওড়নাটা বুকে-মাজায় বাধা। দীর্ঘ বেণী দুটো ছোবল দেয়া সাপের ভঙ্গিতে ভয়ংকরভাবে দুলছে। আপা যাবার পর ক্লাবের বারান্দায় জটলা চলতেই থাকলো। মিলনী সংঘের ওদিক থেকে হই চই-এর আওয়াজ পাওয়া গেল। তবুও আপার সহযাত্রী হবার সাহস কেউ পেল না।

এ সময় এলো পুলিশের ভ্যান। সব শুনে তারা আপাকে এবং পিলুকাকাকে রক্ষা করতে মিলনী সংঘের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলো।

ক্লাবের সবাই পুলিশ ভ্যানের পেছনে পেছনে চললো।

সবাই যখন পৌছালো ততোক্ষণে যা করার আপা একাই করে ফেলেছেন।

আহত পিলুকাকাকে রিকশায় তুলে ফিরে আসছেন। আপার কপালে রক্তের ক্ষীণ ধারা। হাতে হকি স্টিক। আমাকে দেখতে পেয়ে আমার হাত ধরে জটলা থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ির দিকে হাটা দেয়ার আগে আমাদের ক্লাবের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে শুধু অবজ্ঞা ভরে উচ্চাণ করলেন, হুহ, বীরপুরুষ সব!

পরদিন জানা গিয়েছিল, আপাকে বাধা দিতে এসে মিলনী সংঘের মোট সাতজনকে আহত হয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

এরপরে ঘটনা যেভাবে গড়াতে শুরু করলো তাতে অনেক কিছুই হতে পারতো। এমনকি আপাকে আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি পদে বসানোর প্রস্তাবও উঠেছিল। কিন্তু এমন সময় বাসা থেকে চট করে আপার বিয়ে ঠিক করে ফেলা হলো। এবং সত্যি সত্যিই বিয়ে হয়ে গিয়ে আপা শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন।

বিয়েতে আপাকে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে সুন্দর সোনার চেইন দেয়া হলো। লকেট স্বরূপ ঝুলছিল সোনার তৈরি খুদে হকি স্টিক।

বধূ বিদায়ের সময় বাসার সবার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আপাও যখন কাদছিলেন, সেক্রেটারি পিলুকাকা অস্ফুট স্বরে বলে ফেললেন, কাদতে দেখে এতোদিনে বিশ্বাস হলো হামিদা আসলে মায়ের জাত।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জার্নির ক্লান্তিতে। আপার ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

অবেলায় আর ঘুমাস না মন্টু। ওঠ, চা খেয়ে তোর দুলাভাইয়ের সঙ্গে নিউ মার্কেটে যা। একটা খেলনা পিস্তল কিনে নিয়ে যায়। কয়েকদিন ধরে পিংকু খুব ঘ্যানঘ্যান করছে।

বুঝলাম ঝগড়া ইজ ওভার। ফলাফল আপা বিজয়ী। কবেই বা দুলাভাই জিতলো!

ঘরে এলো দুলাভাই, পিংকু–রিংকু সবাই। রিংকু চায়ের মাগ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, চা খাও মামা। মন খারাপ করে থেকো না। তোমার আপা–দুলাভাই মাসে দুবার ঝগড়া না করে খাবার হজম করতে পারে না।

হেসে উঠলেন দুলাভাই–আপা উভয়েই।

কে বলবে কিছুক্ষণ আগেই তারা প্রত্যক্ষ সমরে লিপ্ত ছিল।

চা খেয়ে দুলাভাই আর আমি নিউ মার্কেটের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে দুলাভাই তার প্রাত্যহিক আড্ডায় ঘণ্টা দুয়েক অপচয় করে নিউ মার্কেট থেকে বাকিতে একটা খেলনা পিস্তল কিনে প্যাকেট মুক্ত করে প্যান্টের সাইড পকেটে রেখে হাসতে হাসতে ব্যাখ্যা স্বরূপ বললেন, তোর আপাকে চমকে দেবো। বলবে, খেলনা পিস্তল বাজারে পাইনি। তাই আসল মাল কিনে এনেছি।

বাসার উদ্দেশ্যে যখন রিকশায় উঠলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

ঘড়ি দেখে দুলাভাই বললেন, তাড়াতাড়ি চল মন্টু। এগারোটা বেজে গেলে তোর আপা আজ আর দরজা নাও খুলতে পারে। দুই রাত এ জন্য বাড়িওয়ালার ড্রয়িংরুমে বসে কাটাতে হয়েছে।

আমাদের রিকশা যখন ঘোড়ামারা পোস্ট অফিসের গলিতে ঢুকেছে তখনই ছিনতাইকারীদের হাতে পড়লাম। পাচজন। হাতে ভোজালি, ছুরি, চাকু ইত্যাদি।

রিকশা থেকে আমাদের নামিয়ে রিকশাচালককে কষে লাথি মারলো। রিকশাচালক পালালো তার রিকশা নিয়ে।

আমার পকেটে বিশ বাইশ টাকার মতো ছিল। তা একজন নিয়ে নিল। ঘড়িটাও খুলে নিল একজন। দুলাভাইয়ের ঘড়ি আর মানিব্যাগ নেয়ার পর প্যান্টের সাইড পকেটে হাত দিল।

আচমকা গর্জে উঠলেন দুলাভাই। খবরদার, হাত দিও না ওখানে। এর জন্য ঝগড়া করতে করতে জান বেরিয়ে গেছে। এটা বাসায় না নিয়ে গেলে কেয়ামত হয়ে যাবে।

দুলাভাইয়ের গর্জনে সামান্য ভড়কে গিয়ে ছিনতাইকারীদের একজন চাকু চার্জ করে বসলো, চুপ শালা, মাস্তানি করছো আমাদের সঙ্গে।

এরপরে যা ঘটলো আমি এবং ছিনতাইকারী পাচজনের কেউ–ই তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দুলাভাইয়ের লেফট হুকে একজন আর নকআউট পাঞ্চে আরেকজন সরাসরি নকআউট হয়ে বসে পড়লো। বাকিগুলোর একজন পালাতে পারলেও আর দুজন সরাসরি নকআউট হয়ে বসে পড়লো।

সদ্য কেনা খেলনা পিস্তলটা ততোক্ষণে বের করে বাগিয়ে ধরে হুংকার ছাড়লেন দুলাভাই, পালালেই গুলি করে মারবো সব কয়টাকে।

ভড়কে গেল ছিনতাইকারীরা চকচকে পিস্তল দেখে।

যে লোকটা আমার আপার মতো মেয়ের সঙ্গে দীর্ঘ একযুগ নিরবচ্ছিন্নভাবে বহাল তবিয়তে ঘর–সংসার করছেন তার যে কিছু বিশেষ যোগ্যতা আছে সেটার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেলাম।

পিস্তলের মুখে ছিনতাইকারী চারজনকে এলোপাথাড়ি মারধোর করে প্রায় আধমরা করে ফেললেন দুলাভাই। আমাকেও তার কড়া নির্দেশে হাত লাগাতে হলো।

থানা বেশি দূরে না। ঘোড়ামারা পোস্ট অফিস পার হলেই বোয়ালিয়া থানা। সেখানে ছিনতাইকারীগুলোকে পিস্তলের কভার দিয়ে আনা হলো। ডিউটি অফিসার দেখা গেল দুলাভাইয়ের বন্ধু স্থানীয়।

আরে করছো কি, কাদের ধরে নিয়ে এলে? ছিনতাইকারী মনে হচ্ছে!

দুলাভাই গম্ভীরভাবে বললেন, সে তুমি তোমার খুশি মতো যে কোনো কেসে তাদের ধরতে পারো। শুধু একটা রিকোয়েস্ট, আজ রাতেই আবার ছেড়ে দিও না। তাহলে বাড়ি যাবার পথে আবার ঝামেলা বাধাতে পারে।

থানার ঝামেলা শেষ করে বেরিয়ে আসার সময় আহত ছিনতাইকারীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোদের ভাগ্য ভালো যে, আমার বৌ আজ আমার সঙ্গে ছিল না।

থানা থেকে বেরিয়ে এসে দুলাভাইকে নিয়ে গেলাম একটা ফার্মাসিতে। কনুই–এর কাছে বেশ অনেকটা কেটে গেছে। ব্যান্ডেজ বাধা যখন শেষ হলো, ফার্মাসির দেয়াল ঘড়িরতে ঢং করে রাত একটা বাজার শব্দ হলো।

চমকে উঠে দুলাভাই ফার্মাসির ভদ্রলোককে বললেন, মাথাতেও একটা ব্যান্ডেজ বেধে দেন ভাই।

কেন, মাথাতে তো কোনো জখম হয়নি। ফার্মাসির ভদ্রলোকের প্রশ্ন।

দুলাভাই ম্লান হেসে বললেন, হয়নি। কিন্তু রাত দেড়টায় বাসায় ফিরলে মাথায় জখম হতে পারে। ফ্যামিলি সিক্রেট ভাই।

আচ্ছা বেধে দিচ্ছি। হাসতে হাসতে বললেন ফার্মাসিভাই।

রিকশায় করে ফিরতে ফিরতে দুলাভাইকে হঠাৎ পিস্তল বের করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

দুলাভাই বললেন, আরে তোর আপার ভয়ে আর ছিনতাইকারীদের ওপর রাগে আমার খেয়ালই ছিল না যে ওটা খেলনা পিস্তল।

বাসায় যখন ফিরলাম তখন রাত দুটো বেজে গেছে। কলিংবেল টিপলাম। ভেতর থেকে আপার প্রশ্ন, কে?

আপা, আমরা, দরজা খোলো। বললাম আমি।

সকালে খুলবো, রাত এগারোটার পর বাসায় ঢোকা নিষেধ। যেখানে এতোক্ষণ ছিলি সেখানে যা দুজন। বললেন আপা।

আর সহ্য করতে পারলাম না। চিৎকার করে বলেই ফেললাম, দরজা খোলো আপা, আমাদেরকে ছিনতাইকারী ধরেছিল, দুলাভাইকে ভোজালি মেরেছে।

ঘরের আলো জ্বলে উঠলো, দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন আপা। হাতে ও মাথায় বেশ চওড়া ব্যান্ডেজ বাধা আমার সাহায্য নিয়ে কাত হয়ে দাড়িয়ে থাকা দুলাভাইকে দেখে হাউমাউ করে কেদে উঠলেন, তোমার কি হলো গো...।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

আপাকে আশ্বস্ত করতে লাগলেন দুলাভাই।
আরে কিছু হয়নি, একটু কেটে গেছে, ছিনতাইকারী শালাদের থানায় দিয়ে আসতেই দেরি হয়ে গেল।
ঘুম থেকে রিংকু, পিংকি উঠে এলো। পিস্তলটা রিংকুকে দিতেই খুশিতে লাফাতে লাগলো। এটা দিয়ে সব ছিনতাইকারী গুলি করে মারবো।
পিংকি আমায় ফিশ ফিশ করে জিজ্ঞাসা করলো, কি ব্যাপার মামা?
তাকে সব কিছু সংক্ষেপে বলতেই সে মুচকি হেসে টেবিলে খাবার দিতে চলে গেল।
আপা এর মধ্যে দুলাভাইকে খাটে তুলে আরাম করে হেলান দিয়ে বসালেন।
আপাকে আড়াল করে দুলাভাই আমার উদ্দেশ্যে চোখ টিপলেন।
আচলে চোখ মুছতে থাকা আমার লৌহমানবী আপাকে দেখতে দেখতে মনে পড়লো আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি পিলুকাকার কথা যতো।
যাই হোক। আপাও তো আসলে মায়ের জাত।

ঘোড়ামারা, রাজশাহী থেকে

সান্ত্বনা

- ফেরদৌসী চৌধুরী

মানুষ সান্ত্বনা নিয়ে বেচে থাকে। কিন্তু অনেক সান্ত্বনা রয়েছে যেগুলো মেনে নিতে কষ্ট হয়। তেমনি আমার জীবনে দুই একটি সান্ত্বনা পাবার ঘটনা ঘটেছিল যা আমার স্মৃতিপটে আজও জেগে আছে।
সাধারণত মানুষ যখন একজনকে কিছু দিতে ব্যর্থ হয় তখন যে মিথ্যা আশ্বাস দেয় সেটাকেই আমরা সান্ত্বনা বলি। সেই সান্ত্বনাই তুলে ধরছি।
আজ থেকে পনেরো ষোল বছর পেছনে যেতে হয়। কিন্তু যা আজও মনে আছে। মনে হলে কষ্ট লাগে। আমার বাবা স্কুল মাস্টার। আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। ফলে অনেক শখ-আহ্লাদ পূরণ করতে পারতেন না। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ সালের কোনো এক ঈদের আগে বাবাকে বললাম, গহনা, কানের দুল নেবো।
বাবা বললেন, দেবো।
কিন্তু হায় কপাল, ঈদ এসে চলে গেল। বাবার অঙ্গীকার শুধু সান্ত্বনার অঙ্গীকার রয়ে গেল।
উৎসব-আনন্দের ঈদ ব্যথায় ভরে গেল। যাহোক, অতীত এবং বর্তমান পৃথক দুটি সময়। কিন্তু এখনো আমার অতীতের ওই স্মৃতির কথা মনে পড়ে। বাবার ওই আশ্বাসের কথা ঈদ এলেই মনে হয়।
বাবার আশ্বাস, সান্ত্বনা ভোলা গেলেও একটি আশ্বাস কথা ভুলতে পারি না। যে আশ্বাস আমার নিঃশ্বাসে অস্তিত্বে এখনো বিদ্যমান, যে সান্ত্বনা বার বার মনকে পুড়িয়ে দেয়। ১৯৯১ সালের কোনো একদিনের কথা হবে। তখন অনার্সে পড়ি।
আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আমার সঙ্গে আলাপ করার সময় হঠাৎ বলে বসলো, তোর সেই জন নাকি এবার দেশে ঈদ করবে।
এটা ছিল তার মিথ্যা সান্ত্বনা, মিথ্যা আশ্বাস। তারপরও ঈদ এলেই তার মিথ্যা সান্ত্বনা বিশ্বাস করে তার সন্ধান করি।
পৃথিবীর কাছে আজ আমার প্রশ্ন, মানুষ মানুষকে উপহার দেয়। কিন্তু আমার উপহার শুধুই কি সান্ত্বনা? এরপরও আমি বিচলিত নই। কেননা নিজেকে একজন গর্বিত, হতভাগ্য প্রেমিকা মনে করি। তাই সান্ত্বনা আমার বেচে থাকার শ্রেষ্ঠ উপহার।

নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে

অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ

- হোসেন তৌহিদ জুয়েল

বিয়ারের ক্যানে হালকা চুমুক দিয়ে মারুফ বিশাল রুমটির এক কোণায় গিয়ে দাড়ালো। আধো আলো আর মিউজিকের তালে পুরো রুমটি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে। মারুফ পুরো রুমটির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। অনেক মানুষের ভিড়। রুমটি বিশাল হলেও যে পরিমাণ মানুষ জমেছে তার জন্য রুমটি অতোটা বড় নয়। তারপরও সে নিজেকে ভিড় থেকে একটু আড়াল করে নিল। না করে উপায় নেই। পার্টিতে আসা বেশির ভাগ মানুষই মারুফের অপরিচিত।

এখানে অবশ্য পরিচিত বা অপরিচিত দিয়ে তেমন কিছু যায় আসে না। হুট করে হাই, হ্যালো বলে যার– তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দেয়া যায়। তবে এ ব্যাপারটির সঙ্গে মারুফ এখনো অতোটা অভ্যস্ত নয়। তার ওপর এটা হলো ইনডিয়ানদের পার্টি। ইনডিয়ানদের সঙ্গে মারুফের কেন যেন খুব একটা ভালো জমে না! এরপরও তার আজকের এ পার্টিতে আসার মূল কারণ হলো, তার বন্ধু ও সহকর্মী উমেশ। হ্যা, আজ উমেশ তার নতুন বাড়িতে ওঠা উপলক্ষে হোম শাওয়ার মার্কা একটি পার্টি দিয়েছে। আর যাই হোক, উমেশের নিমন্ত্রণ সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবে না।

উমেশ ইনডিয়ান। সে মারুফের খুবই ভালো বন্ধু। তারা একই সঙ্গে টেক্সাসের হিউস্টনের একটি সফটওয়্যার কম্পানিতে গত দুই বছর ধরে কাজ করছে। পরিচয়ের প্রথম থেকেই বেশ ভালো একটা বন্ধুত্ব হয়ে যায় উমেশের সঙ্গে মারুফের। তখন থেকেই মারুফের কোনো অনুরোধ বা নিমন্ত্রণ যেমন উমেশ ফেলতে পারে না ঠিক তেমনি উমেশেরও কোনো অনুরোধ কিংবা নিমন্ত্রণ মারুফের পক্ষে ফেলা অসম্ভব।

হাই মারুফ, কি ব্যাপার? এ রকম গম্ভীরভাবে এক কোণায় দাড়িয়ে আছো যে? খুব বোর ফিল করছো বুঝি।

হঠাৎ করে উমেশের স্ত্রী পূজার কণ্ঠস্বর শুনে মারুফের অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেল। সে সহজ গলায় মৃদু হেসে বললো, আরে না, বোর ফিল করবো কেন? জাস্ট একটু রিলাক্স করছি।

পূজা হাসলো। তারপর বললো, এভাবে একা একা দাড়িয়ে রিলাক্স করতে হবে না। তোমার সঙ্গে গল্প করার জন্য একজনকে ধরে এনেছি। বলেই পূজা তার ঠিক পাশে দাড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে বললো, শায়লা, এ হলো তোমাদের বাংলাদেশের মারুফ। উমেশের খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড। তারপর মারুফের দিকে তাকিয়ে পূজা বললো, আর এ হলো আমার খুব ক্লোজ ফেন্ড শায়লা। অ্যান্ড লাইক ইউ, শি ইজ ফ্রম বাংলাদেশ।

মারুফ এবার যেন একটু কৌতূহল মাখা চোখেই শায়লার দিকে তাকালো। যদিও রুমের আধো আলোতে কারোই মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মারুফ কিছু বলার আগেই শায়লা সৌজন্যমূলক ভঙ্গিমায় হেসে বললো, নাইস টু মিট ইউ মি. মারুফ।

মারুফও মৃদু হেসে বললো, নাইস টু মিট ইউ টু।

পূজা এবার বললো, তোমরা কথা বলো, আমি একটু ওদিকটা সামলাই। উমেশটা মোটেও কাজের নয়। বলেই ঝট করে হারিয়ে গেল পূজা।

শায়লা আর মারুফ দুজনেই হাসলো।

মারুফ আর শায়লা দুজন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ হয়ে রইলো। মারুফ ঠিক বুঝতে পারছে না কি বলবে। অবশ্য খুব স্বাভাবিকভাবেই শায়লাকে জানার জন্য সে যথেষ্ট কৌতূহল বোধ করছে। আফটার অল শায়লা বাঙালি মেয়ে। যে মারুফের এক সময় দেশে থাকতে বাঙালি মেয়েদের প্রতি কোনো আগ্রহই ছিল না, সব সময় শুধু ভাবতো কবে তার একটি সুন্দরী ব্লন্ড গার্লফ্রেন্ড হবে সেই মারুফ এখন মাঝে মধ্যে আনমনেই যেন ভেবে বসে কবে তার পরিচয় হবে একজন স্মার্ট লাবণ্যময়ী বাঙালি মেয়ের সঙ্গে।

মারুফকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে শায়লাই প্রথমে বললো, তারপর কতোদিন ধরে আপনি হিউস্টনে আছেন?

এই তো, বেশি দিন না। আড়াই বছর হতে চললো। আর আপনি?

আমি? অনেক বছর। আমার বয়স যখন চার তখনই আমার বাবা মা বাংলাদেশ ছেড়ে এখানে এসে সেটলড করেন।

মারুফ মৃদু হেসে বললো, ওয়াও! তার মানে আপনি এবিসিডি? আমেরিকান বর্ন কনফিউজড দেশি। (American Born Confused Deshi = ABCD)।

শায়লা একটু যেন রাগ মেশানো গলায় বললো, ও কাম অন। আমার এখানে জন্ম হয়নি।

মারুফ ঠাট্টা মেশানো স্বরে বললো, ওই একই কথা। জন্ম হওয়া আর চার পাচ বছর বয়স থেকে এখানে বড় হওয়া সবাই কনফিউজড দেশি।

শায়লা ধমকের সুরে বললো, শাট আপ। আই অ্যাম নট এ কনফিউজড দেশি, আই অ্যাম এ পিওর বাঙালি।

মারুফ আবারও হেসে বললো, জাস্ট কিডিং।

ইটস ওকে। আই নো ইউ আর কিডিং।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে মারুফ বললো, তা আপনি এখন কি করছেন? পড়াশোনা, নাকি জব?

এই তো মাত্র তিন মাস আগে গ্র্যাজুয়েশন করলাম। এখন একটা প্রাইভেট কম্পানিতে কাজ করছি। তবে আমার খুব শখ একটা স্টেট বা ফেডারাল জব খোজা। চেষ্টা চলছে।

গুড লাক।

থ্যাংকস। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ?

আমি এই তো একজন অতি শাদামাটা প্রোগ্রামার। উমেশের সঙ্গে একই অফিসে কাজ করছি গত দুই বছর ধরে।

মুখের মধ্যে এক ধরনের কৃত্রিম বিরক্তিকর ভাব নিয়ে এসে শায়লা বললো, উমম, সো ইউ আর এ কমপিউটার প্রোগ্রামার! এই কমপিউটার প্রোগ্রামার আর ইঞ্জিনিয়ার এরা আমার দৃষ্টিতে মোস্ট বোরিং পারসন।

মারুফ হাসলো।

সরি, মাইন্ড করলেন না তো আবার? সরাসরি বলে ফেললাম।

মারুফ মুখের মধ্যে একটু গম্ভীর ভাব এনে বললো, খুবই মাইন্ড করলাম। পরক্ষণেই হেসে ফেললো।

শায়লাও হাসলো।

তারপর মারুফ মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, তা ইঞ্জিনিয়ার বা কমপিউটার প্রোগ্রামারদের ওপর এতো রাগ কেন আপনার বলুন তো, জানতে পারি কি?

ঠিক রাগ না। তবে এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ যেসব ইঞ্জিনিয়ার বা কমপিউটার প্রোগ্রামারদের দেখেছি, তাদেরকে কেমন যেন...। আচ্ছা, বাই দি ওয়ে, আপনি বুয়েট গ্র্যাজুয়েট না তো?

মারুফ হাসলো। হাসতে হাসতেই বললো, না বাবা আমি অতো বৃলিয়ান্ট না। বুয়েটে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেই আমেরিকাতে চলে আসি। তারপর এখান থেকেই আন্ডার গ্র্যাড আর মাস্টার্স শেষ করি।

যাক বাবা, বাচা গেল। আপনি বুয়েটের না। যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শায়লা বললো।

মারুফ কিছুটা বিস্মিত হয়েই যেন বললো, বুঝলাম না। বুয়েট আবার কি দোষ করলো আপনার সঙ্গে। বুয়েটের ছেলেদের তো চারদিকে কতো সুনাম চাকরির বাজারে, পাত্রীর বাজারে...।

মারুফকে কথা শেষ করতে দিল না শায়লা।

ও প্লিজ, এনাফ ইজ এনাফ, থামেন তো এবার। আমি এ পর্যন্ত যে কয়টা বুয়েটের ছেলে দেখেছি ...। কি আর বলবো, বুঝলাম তারা হয়তো অনেক বৃলিয়ান্ট। ভালো জব করে। তবে বেশির ভাগই তো দেখলাম যে, ঠিক মতো সোজা হয়ে দাড়িয়ে কথা বলতে পারে না।

মারুফ হাসলো, কিছু বললো না।

শায়লা আবার বলা শুরু করলো। বুঝতেই পারছেন, আমার তো এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, বাবা মা চাচ্ছেন খুব ভালো কোনো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে। ওই যে বাঙালি কালচারের অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ যাকে বলে আর কি! তবে তারা আমাকে একের পর এক তাদের ভাষ্য অনুযায়ী যে ভালো ছেলেগুলো দেখাচ্ছে তাদেরকে দেখে তো আমার তথাকথিত ভালো ছেলেদের প্রতি ইন্টারেস্ট দিন দিন কমছে শুধু।

মারুফ এবার খোচা মারার মতো করেই বললো, উম, এবিসিডিরা তাহলে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজেও বিশ্বাস করে? আমি তো ভেবেছিলাম এখানে বড় হওয়া বাঙালি ছেলেমেয়েরা সবাই আমেরিকানদের মতোই...।

মারুফ তার কথাটি শেষ করতে পারলো না। শায়লা তাকে থামিয়ে দিয়ে কিছুটা রাগী স্বরেই বললো, উফ, আমি বললাম তো এবিসিডি না। এখানে বড় হলেও আমি পুরোপুরি বাঙালি কালচার মেইনটেইন করেই বড় হয়েছি। আর আপনি...।

এবার মারুফ শায়লাকে থামিয়ে দিয়ে হেসে বললো, আই ওয়াজ জাস্ট কিডিং। আপনার সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ কথা বলেই টের পেয়েছি আপনি ও রকম নন। জাস্ট মজা করছিলাম। তবে লক্ষ্য করেছি, রেগে গেলে আপনাকে বেশ সুন্দর লাগে। তাই আপনাকে একটু রাগিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করছিলাম।

শায়লা এবার একটু লাজুক ভঙ্গিমায় হেসে বললো, আপনি তো বেশ দুষ্টু মনে হচ্ছে। যাক, আপনাকে আর টিপিকাল কমপিউটার প্রোগ্রামার বা ইঞ্জিনিয়ারদের মতো যান্ত্রিক মনে হচ্ছে না।

শায়লা হাসলো।

মারুফও হাসলো।

সেদিন ও পর্যন্তই কথা হয়েছিল দুজনার। এরপর পার্টির ভিড়ের মধ্যে একটু আসছি বলে শায়লা যে কোথায় গেল, মারুফের সঙ্গে আর দেখা হলো না। একটু আফসোস হলো বৈকি মারুফের। মেয়েটার ইমেইল বা ফোন নাম্বার কিছুই নেয়া হলো না। মারুফ একবার ভাবলো উমেশকে বলবে তার স্ত্রী পূজার মাধ্যমে যদি এগুলো জোগাড় করা যেতো! তবে পরক্ষণেই আবার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেললো। নিজেকে সে এভাবে করে ছোট করতে ইচ্ছুক নয়।

তবে সে পার্টির প্রায় এক সপ্তাহ পরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে ই-মেইল চেক করতে গিয়েই মারুফ একটি মেইল পেল যাতে প্রেরকের নাম হিসেবে লেখা আছে শায়লা জামান।

স্বাভাবিকভাবেই খুবই কৌতূহল নিয়ে মারুফ মেইলটির ওপরে ক্লিক করলো। হ্যা, এতো শায়লারই লেখা মেইল। খুবই সংক্ষেপে অবশ্য মেইলটি করেছে শায়লা।

সরি মারুফ, সেদিন পার্টিতে আপনাকে একটু ওয়েট করতে বলে আমি যে অন্যদিকে গেলাম তারপর ফিরে এসে দেখি আপনি নেই। আসলে হঠাৎ পূজাকে নিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আপনাকে সেটা জানানোর জন্যই পূজার কাছ থেকে আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেসটি নিয়েছি।

মারুফ মনে মনে হাসলো। মনে মনে বললো, মেয়েটিকে ভালোই চালাক মনে হচ্ছে। ই-মেইল করার পেছনে একটি ভালো কারণই দাড় করিয়ে ফেলেছে। মারুফও তার ই-মেইলের রিপ্লাই দিল।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দুজনের মধ্যে ডজন খানেক ই-মেইলের লেন-দেন হয়ে গেল। দুজনের মধ্যে মোবাইল ফোনেও কয়েকবার কথা হলো। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে মারুফের বেশ ভালোই লাগে। মারুফ

মনে মনে ভাবে, আচ্ছা, শায়লারও কি ভালো লাগে আমার সঙ্গে কথা বলতে? নিশ্চয় লাগে। না হলে তো সে নিশ্চয় এতোক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে এতো কথা বলতো না।

মারুফ অবশ্য নিজেকে সামলে নেয়। মনে মনে ভাবে, তার আগ বাড়িয়ে এতো আবেগ প্রবণ হওয়ার দরকার নেই। আর শায়লা আজকালকার মেয়ে। তাও আবার আমেরিকাতে বড় হওয়া। এদের আবেগের কোনো ঠিক–ঠিকানা নেই। আজকে হয়তো এতো আবেগ মেখে কথা বলছে, কালই হয়তো বলবে ভিন্ন কথা।

এর মধ্যে মারুফের মা আবার মারুফকে নতুন এক মেয়ের ছবি পাঠিয়ে বলেছেন মেয়ে আর মেয়ের ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলতে। মেয়ের মা নাকি মারুফের মায়ের এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাজিন। মেয়েটিও নাকি তার ফ্যামিলিসহ হিউস্টনেই থাকে।

মারুফ অবশ্য আগ্রহ নিয়েই মেয়েটির ছবি দেখলো। একদম মডেল মার্কা পোজ দিয়ে তোলা ছবি। বেশ সুন্দরই তো মেয়েটা। মেয়েটার নাম তিন্নি। মারুফের মা ইমেইল করে মেয়েটির ছবি, তার নাম আর বাসার ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছেন। মেয়ের পক্ষকে নাকি সব জানানোই আছে। তারা ছেলের ফোনের জন্য অপেক্ষা করছে। মেয়েপক্ষ চাচ্ছে আগে ছেলেমেয়ে কথা বলে দেখুক। তাদের কথাবার্তা পজিটিভ হলে তবেই গার্ডিয়ানরা বিয়ের ব্যাপারে ফাইনাল কথাবার্তা বলবেন।

মারুফ ঠিক করলো সামনের উইকএন্ডেই কল করবে।

মারুফ তার মন ঠিক মতো স্থির করতে পারছে না। তিন্নি নামের এ মেয়েটির প্রতি সে এক ধরনের আগ্রহ বোধ করছে ঠিকই তবে ঘুরে–ফিরে শায়লার কথায় তার বার বার মাথায় ঘুরছে। শায়লার সঙ্গে ফোনে একবার কথা বলতে বসলে তার অন্য কিছু চিন্তা করতে ভালো লাগে না। কেমন করে যে সময় পার হয়ে যায়! যদিও দুজনের মধ্যে কোনো কমিটমেন্ট নেই। মারুফও স্ট্রেট কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না শায়লাকে। আর যাই হোক, নিজেকে ছোট করা যাবে না। দুজনের মধ্যে যে কথা বলতে বলতে এক ধরনের ভালো লাগা হয়ে গেছে সেটাই দুজনই অনুভব করতে পারে।

দেখতে দেখতে উইকএন্ড চলে এলো। দুপুরেও মোবাইল ফোনে ঘণ্টা দুয়েক শায়লার সঙ্গে কথা হলো মারুফের। মারুফ এক পর্যায়ে অন্যভাবে শায়লাকে জিজ্ঞাসা করে, সে মারুফকে পছন্দ করে কি না।

শায়লা প্রশ্নটি এড়িয়ে যায়।

মারুফ কিছুটা বিরক্ত হয়। তবে কিছু বলে না।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় মারুফ টেলিফোন নিয়ে বসে তিন্নিদের বাসায় ফোন করার জন্য। এমন একজনের বাসায় সে এখন ফোন করতে যাচ্ছে যাকে মারুফ চেনে না, জানে না, এমনকি এ পরিবারের কোনো সদস্যদেরকেও মারুফ চেনে না। এ রকম পরিস্থিতিতে তার একটু নার্ভাস লাগারই কথা। তবে মারুফের তা লাগলো না। খুব সহজ, স্বাভাবিকভাবেই সে ফোন করলো।

ওপাশ থেকে এক মহিলা ফোন ধরলেন। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মারুফ...।

মারুফের আর তেমন কিছুই বলতে হলো না। ওপাশ থেকে ভদ্রমহিলাই বলতে লাগলেন, ও তুমি মারুফ। হ্যা, তোমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি তিন্নির মা বলছি। এই বলে ভদ্রমহিলা আরো কিছুক্ষণ গেজালেন। তারপর এক সময় তিন্নিকে ফোনটা দিলেন।

হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম। ওপাশ থেকে তিন্নির মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

ওলাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি? কণ্ঠের মধ্যে খুব ভদ্রতার একটা রেশ এনে বিনীতভাবে মারুফ প্রশ্নটি করলো।

ওপাশ থেকে মেয়েটি যেন একটু হেসে বললো, জি, আমি ভালো। আপনি কেমন আছেন?

মারুফের হঠাৎ মনে হলো, আরে এতো খুব চেনা চেনা গলা। সে নিজেকে সামলে নিয়ে আরো টুকটাক দুই চারটা কথা বললো। এরপর হঠাৎ করে মারুফ সত্যিই না চমকে পারলো না। আরে, এতো হুবহু শায়লার গলা! একই কথার স্টাইল!

মারুফ এবার নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, আচ্ছা তিন্নি, আপনার গলাটা আমার কেন যেন খুব চেনা চেনা লাগছে।

ওপাশ থেকে তিন্নি একটু হেসে ফেলে বললো, হয়তো চেনা গলা, তাই চেনা চেনা লাগছে।

আচ্ছা তিন্নি, আপনার ভালো নামটি আমার এখনো জানা হয়নি।

তিন্নি এবার শব্দ করে হাসলো। তারপর হাসি থামিয়ে মৃদু গলায় বললো, শায়লা জামান।

মারুফ একেবারে থ। একটু বিব্রত বোধ করলো ঠিকই আবার একই সঙ্গে প্রচণ্ড অবাকও হলো বৈকি। একটু চিৎকার করেই যেন বলে উঠলো, শায়লা, তুমি?

হ্যা, আমি। খুবই অবাক হয়েছো, তাই তো?

হ্যা, তা তো হয়েছি। তবে... ,মানে..., ইয়ে...।

শায়লা ওরফে তিন্নি হাসলো। তারপর বললো, উম, বুঝতেই পারছি। দুপুরে শায়লা জামানের সঙ্গে খুবই ফ্লার্ট করলে আর এখন বাবা মায়ের পছন্দ করে দেয়া মেয়ে তিন্নির সঙ্গে...! কথার মাঝেই হাসতে লাগলো তিন্নি। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, কাম অন মারুফ, ডোন্ট ফিল এমবারাসড। আমিও তো করেছি, তাই না। তবে তোমার কথা জেনেছি গতকাল রাতে। মা আমাকে রাতে ডিনারের পরে তোমার কথা বললেন, তোমার একটা ছবিও দেখালেন। প্রথমে আমিও অবাক। একদম পুরো নাটকের মতো যেন লাগলো ব্যাপারটা। নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। এটা যে তুমি সেটাও পুরোপুরি শিওর ছিলাম। তোমাকে ওই দিন রাতে পার্টিতে যে রকম লেগেছিল, ছবিতে অন্য রকম লাগছিল। এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে থামলো শায়লা।

এবার মারুফ বললো, আর তোমার যে ছবিটা পেয়েছি তার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছি না সেদিনের সে পার্টিতে দেখা শায়লাকে।

শায়লা হাসলো। বললো, বিয়ের জন্য দেয়া ছবিগুলো এমনই হয়। আমার যে ছবিটা খুব সম্ভবত তুমি পেয়েছো ওটা প্রায় তিন বছর আগের ছবি। তখন আমার চুলগুলো স্ট্রেইট ছিল। এখন অন্য রকম করে ফেলেছি চুলগুলো। তাছাড়া সেদিনের ওই পার্টিতে যখন আমাদের দেখা হয়েছিল তখন বেশ অন্ধকারই ছিল রুমটা। সো আমরা কেউ–ই কাউকে অতোটা ভালো করে দেখতে পাইনি।

মারুফের এখনো যেন ঘোর কাটছে না। এখনো অসম্ভব অবাক সে। তবে সেই সঙ্গে কেমন যেন এক ধরনের ভালো লাগাও সে অনুভব করছে। মনে মনে বলছে, ওয়াও! ইটস মাই ড্রম গার্ল শায়লা!

মারুফকে চুপ করে থাকতে দেখে শায়লা বললো, কি চুপ কেন? পাত্রী কি অপছন্দ হলো?

মারুফ একটু ঠাট্টা করে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলো, না, উল্টোটা ভাবছি। পাত্র অপছন্দ হলো কি না।

দুজনই হেসে ফেললো।

ঠিকানা বিহীন
htouhid@yahoo.com

রহস্য

- মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বিয়ের আমেজ শুরু হয়ে গেল কিছু দিন আগে থেকেই। প্রতিদিন কিছু না কিছু অতিথি আসছেই। বাসা ভরে গেল অতিথিতে। আমার রুমটি ছেড়ে দিয়েছি অতিথির জন্য।

কূল-কিনারা না পেয়ে ভাবীর রুমে আশ্রয় নিয়েছি। ভাবী একা থাকেন। ভাইয়া বাইরে চাকরি করেন। এক সপ্তাহ পর পর আসেন। তাই ভাবী সহজেই রুমটি ছেড়ে দিলেন। বলতে গেলে *বিনা যুদ্ধে সুচাগ্র মেদিনী* পেয়ে গেলাম।

ভাবী যোগ দিয়েছেন অতিথির সঙ্গে। গল্প-গুজব, আড্ডা চলে গভীর রাত ধরে। এক সময় সবাই মেঝেতে বিছানা করে ঘুমিয়ে পড়ে। দেখে মনে হয় যেন রেল স্টেশনের রাতের দৃশ্য।

এক মাস পর পরীক্ষা আমার, পড়ার চাপ প্রবল। বেছে বেছে এমন সময় বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে যখন আমার পরীক্ষা। এমনই হয়! মন্দ ঘটনাগুলো আমার ক্ষেত্রেই বেশি ঘটে।

দুঃখজনক হলেও এমন আনন্দ-উৎসবের মধ্যে রাতভর পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রতিদিনের মতো ভাবী বিছানা করে দিচ্ছেন।

ভাবী বড়ই চঞ্চল প্রকৃতির। যে কোনো কাজ ঝটপট করেন। কাজ করার আগে কখনো ভাবেন না। কাজ করার পর ভাবার প্রশ্নই ওঠে না। *ধর তক্তা মার পেরেক* টাইপের কাজ।

ভাবী মোটামুটি শিক্ষিত। তবে তার মধ্যে কিছু কুসংস্কার রয়েছে।

মূল্যহীন সম্পদটি তিনি সম্ভবত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন।

বিয়ে হয়ে ভাবী প্রথম যখন বাসায় আসেন, কিছু দিনের মধ্যে এই বাড়িটিকে এক ভৌতিক বাড়িতে পরিণত করে ফেলেন। ভূত-পেতনির যতো সব আজগুবি কাহিনী শুনলাম সবার মুখে।

রাতে ভাবী যখন এক রান্না করেন তখন নাকি আমাদের আঙ্গিনার মাঝখানের আম গাছটি থেকে একটি লোক নেমে আসে। সুযোগ পেলে ভাবীর সঙ্গে গল্পও করে। কি যে সাধের গল্প, কষ্ট করে রাতের বেলা গাছ থেকে নেমে আসতে হবে, এখানেই শেষ নয়। লোকটি মাঝ রাতে ভাবীকে বাইরে ডেকে আনে। আঙ্গিনায় হাটাহাটি করে গল্প করে। বাড়ির অনেকেই ভাবীকে মাঝ রাতে হাটাহাটি করতে দেখেছে। দুর্ভাগ্য, এমন লোকটিকে কেউ দেখেনি। ভূতকে দেখার সৌভাগ্য নাকি সবার হয় না। আরো কতো সব আজগুবি গল্প শুনলাম।

আজকের যুগে এমন পুরনো দিনের ভূতের গল্প চলে না। আজকাল নাশকতামূলক যতো সব বড় বড় ভৌতিক কর্মকাণ্ড ঘটছে তার সামনে এ ধরনের নিরীহ ভূতের প্রভাব যেন হ্রাস পেয়েছে। এ ধরনের ঘটনা হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

অথচ ভাবী কি করে যেন সবাইকে গল্পটি বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছেন। রাত হলেই সবার মধ্যে গা ছম ছম করা ভয় বিরাজ করে। কেউ আঙ্গিনায় একা বের হবার সাহস পায় না। মাঝ রাতে বাইরে বের হওয়ার প্রয়োজন হলে দুই তিনজন দল বেধে বের হয়। আম গাছের কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, এর ত্রিসীমানায় কেউ ঘেষে না।

আমি এসবের ধারে-কাছেও গেলাম না। ভূত হলো মানুষের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কল্পনা। ভূতভাই, পেতনিআপু বলে কিছু নেই এটা ভালোভাবেই বিশ্বাস করি। তবে মাঝ রাতে যখন হিশি করতে বের হই তখন শুধু অযৌক্তিক কারণে গা ছম ছম করে ওঠে। মনে হয় এই বুঝি আম গাছের সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি নেমে এসে বলবে, ভাই আসুন, একটু গল্পগুজব করি।

এখন প্রশ্ন হলো, ভাবী এ ধরনের অবাস্তব কথা বললেন কেন? ভাবী কি বানিয়ে কথা বলেছেন? ভাবী বানিয়ে কথা বলেছেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভালোভাবেই জানি যে, ভাবী বানিয়ে কথা বলেন না। তবে তিনি বানিয়ে কথা বলেননি এটাও পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ একজন মানুষকে সম্পূর্ণ রূপে চেনা বড়ই মুশকিল। কিন্তু আমার ধারণা মতে, তিনি সেই সময় এক ধরনের মানসিক চাপে ছিলেন। বাবা--মা, আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে আসা, আগের পরিচিত বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে খাপ খাওয়ানো, নতুন লোকের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, বিভিন্ন ধরনের কাজের চাপের জন্যে তিনি মানসিক চাপ অনুভব করতেন। ফলে হ্যালুসিনেশন দেখতেন। কোথায়, এখন তো ভাবির মুখে সেই কথাগুলো আর শোনা যায় না!

যে টেবিলে বসে পড়ালেখা করছি, তার পাশে ড্রেসিং টেবিলটি। আয়নার পেছনের সমস্ত দৃশ্য দেখা যায়। ভাবী কি করছেন না করছেন সবই দেখতে পাচ্ছি। একই ভুল ভাবী প্রতিদিন করেন। বিছানা করে, মশারি টাঙানোর পর খেয়াল হয় আমি মশারি ছাড়াই ঘুমাই। তখন মশারি গুটিয়ে ফেলেন। আজও তাই করলেন। মশারি টাঙানোর পর গুটিয়ে ফেললেন।

বিছানা করা শেষ হলে ভাবী চলে গেলেন না। বসলেন কিছুক্ষণ। আজ বুঝি ভাবির ব্যস্ততা নেই।

ভাবীর সঙ্গে তেমন একটা গল্প হয় না। পড়ার যা চাপ! গল্প করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আজ বেশিক্ষণ পড়বো না। ভাবলাম ভাবীর সঙ্গে গল্প করবো। এ রাতে নিশ্চয়ই ভাবি ভূতের গল্প জুড়ে দেবেন না!

লেখা শেষ করলাম। পেছনে ঘুরে বসার আগে আয়নায় একবার তাকিয়ে নিলাম। তাকিয়েই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একি দেখছি! আয়নাতে যাকে দেখছি সেটা ভাবী নয়, অন্য কোনো মেয়ে। এমন বীভৎস চেহারা ভাবীর হতেই পারে না। আমি দ্রুত পেছনে তাকালাম। ওই তো ভাবী বসে আছেন আলপিন পত্রিকাটি হাতে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চেহারা, কোনো পরিবর্তন নেই। তাহলে আয়নাতে ভাবীর চেহারা এমন বীভৎস দেখাচ্ছে কেন?

আবার তাকালাম আয়নার দিকে। ভাবীর চেহারার সঙ্গে তার প্রতিবিম্বের কোনোই মিল পেলাম না। একই পোশাক পরা দুটি ভিন্ন ব্যক্তি যেন। একজন ব্যক্তির প্রতিবিম্ব আরেক ধরনের হতে পারে জানতাম না তো! বিষয়টি এর আগে কখনো লক্ষ্যই করিনি।

আয়নাতে কোনো সমস্যা আছে নাকি? আমি নড়েচড়ে আয়নার বিভিন্ন স্থান থেকে ভাবীকে দেখার চেষ্টা করলাম। না, কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। তাছাড়া আয়নায় সমস্যা থাকতে পারে না। কারণ এই আয়না আমি সব সময় ব্যবহার করি। ভাবীকে এমন দেখানোর কারণ কি, আগ-পিছ ভেবে কিছুই বের করতে পারলাম না। মাথা আমার কাজ করছে না। নিথর হয়ে বসে রইলাম শুধু।

ভাবী বললেন, কি রে পড়া শেষ নাকি? বেশি রাত জাগিস না, ঘুমিয়ে পড়। আর ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিবি। তুই তো আবার ছিটকিনি না লাগিয়েই ঘুমিয়ে পড়িস। কবে চোর এসে বাড়ির সম্পদকে নিজ সম্পদ মনে করে নিয়ে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। এই বলে ভাবী চলে গেলেন।

আমার অনুপস্থিতিতে আয়নাটি পরিবর্তন করা হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য আয়নাটি ভালোভাবে ঘুরিয়ে দেখলাম। কোনো পরিবর্তন পেলাম না। এটা আগের আয়নাটিই।

দীর্ঘ সময় ধরে পড়ার কারণে হ্যালুসিনেশন দেখছি না তো! আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজেকে অনেক্ষণ দেখলাম। চেহারায় কোনো পরিবর্তন খুজে পেলাম না। তাহলে ভাবীর ক্ষেত্রে এখন পরিবর্তন হলো কেন?

দক্ষিণ হাজীপাড়া, ঠাকুরগাও থেকে